কুরআন-হাদীসের আলোকে

মাজহাবের গুরুত্ব ও নামায

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

সম্পাদনা: মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী

খানকায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী

আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার পয়েন্ট, সিলেট।

কুরআন-হাদীসের আলোকে

মাজহাবের গুরুত্ব ও নামায

গ্রন্থনাঃ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

সম্পাদনাঃ মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী

আলী সেন্টার (৪র্থ তলা), সুবিদ বাজার পয়েন্ট, সিলেট।

কুরআন-হাদীসের আলোকে মাজহাবের গুরুত্ব ও নামায

গ্রন্থনা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
সম্পাদনা: মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী

প্রথম প্রকাশ: মুহাররম ১৪৩৩ হিজরী, ডিসেম্বর ২০১১ ঈসায়ী

প্রকাশক:
মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান
সহকারী সচিব, খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ।

কম্পিউটার কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা:
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ

মুদ্রণ: দি কাসওয়া কম্পিউটার, ০১৭১১ ৪৭৮ ২৮৮

মূল্য: ৬০ টাকা

Quran-Hadiser Aloke Mazhaber Gurutha o Namaz (Importance of Mazhab and Namaz according to the light of Quran and Hadiths); by **Engineer Azizul Bari**, edited by **Maulana Faruq Ahmad Jakigangi**. Published by **Khanqa-e-Aminia-Asgaria Prokashoni**, Sylhet. Publication date, December 2011. Price: Tk 60 / £ 2.50

সূচিপত্র

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد :

সম্পাদকের আরজ

আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহর পবিত্র দরবারে শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। তাঁর অপরিসীম কৃপায় 'খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ' থেকে তাক্বলিদ, মাজহাব ও হানাফী পদ্ধতিতে সুন্নাত তরীকায় নামাযের উপর এই গুরুত্বপূর্ণ কিতাবটি আমরা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। এ যুগের বিভিন্ন ফিতনার মধ্যে সর্বাধিক ক্ষতিকর একটি ফিতনা মুসলমানদেরকে দ্বীন পালনে সত্যিই বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করে দিচ্ছে। একদল লোক মাজহাববিরোধী প্রচারণার মাধ্যমে এই ফিতনা ছড়িয়ে দিচ্ছে। তারা বলে বেড়াচ্ছে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের কর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত মাজহাবের কোন প্রয়োজন নেই! তাদের দাবী, দ্বীন পালনে কুরআন ও সুন্নাহকে অনুসরণ করতে হবে, কোন ইমামের অনুসরণ গ্রহণযোগ্য নয়। সাধারণ মানুষকে এরূপ বক্তব্য দ্বারা তারা 'বোকা' বানানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। অথচ পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফকে চয়ন করে আমাদের মহাত্মন আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এবং তাঁদের অনুসারীরা জীবনভর সাধনা করে দ্বীন পালনে সঠিক পন্থা আমাদের জন্য উন্মোচন করে দিয়ে গেছেন। দীর্ঘ ১৪০০ বছর যাবৎ অসংখ্য মুসলমান চার মাজহাবের যে কোন একটি অনুসরণ করে সঠিক দ্বীনদারীর মধ্যে জীবন কাটিয়ে চলে গেছেন। নতুন পথভ্রষ্ট এই 'গ্বাইর মুকাল্লিদ' দলটি এখন এসে ওসব মনভুলানো প্রতারণামূলক কথা দ্বারা মানুষকে গোমরাহ বানাচ্ছে। তাদের ধারণা, অতীতের মুজতাহিদ ইমাম এবং আলিম-উলামাসহ কেউই দ্বীনকে সঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি! আমরা এসব পথভ্রষ্টদের বিভ্রান্তি থেকে আল্লাহর দরবারে ফানা চাই।

বর্তমান কিতাবে আমরা লা-মাজহাবীদের প্রচারণা ও ভ্রান্ত আক্বীদার উপর তেমন বেশী আলোচনা করি নি। বরং আমরা তাক্বলিদ, মাজহাব, হানাফী মাযহাবে সুন্নাত তরীকায় নামায পদ্ধতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর কুরআন-হাদীসের আলোকে আলোচনা করেছি। এ থেকে সাধারণ পাঠকরা সহজেই বুঝতে সক্ষম হবেন যে, মাজহাব মানা ওয়াজিব। প্রত্যেক মুসলমানকে তার পছন্দসই মাজহাব

মুতাবিক আমল করতে হবে। অন্যথায় তিনি বিভ্রান্ত হবেন, এমনকি পথভ্রষ্ট হওয়ারও বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। নৈতিক দায়িত্ববোধে মানুষকে বিভ্রান্তির বেজাড়াল থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় এই কিতাবখানা আমরা প্রণয়ন করেছি। আমরা আশা করবো, এই কিতাবটি পাঠ করার পর লা-মাজহাবীদের খপ্পর থেকে পাঠকরা মুক্ত থাকবেন। নিজেকে পথভ্রষ্টতার বেড়াজাল থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন। আমরা সর্বক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তা'আলার সাহায্য কামনা করি।

অবশেষে খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া সম্পর্কে দু'একটি কথা ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১০ ঈসায়ী যুগের শ্রেষ্ঠ অলিআল্লাহ কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সিলেট শহরের সুবিদবাজারস্থ আলী সেন্টার মার্কেটের উপরে স্থাপিত মডার্ণ জেনারেল হাসপাতালে ইন্তিকার করেন। এর ১৪ দিন পর, অর্থাৎ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১০ ঈসায়ী 'খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া' প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলইহি ও আলী সেন্টারের মালিক অত্র কিতাবের গ্রন্থকার ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারীর পিতা হাজী আলী আসগর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইশারায় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় দ্বীনি খিদমাতের উদ্দেশ্যে এই খানক্বাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দাওয়াত, তালিম, যিকর, ইবাদত, তাযকিয়ায়ে নফস এবং খিদমাতের মাধ্যমে আমরা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। পাঠকদের প্রতি সবিনয় নিবেদন, আপনারা আমাদের জন্য খাস দিলে দু'আ করবেন। আল্লাহ তা'আলা যেনো আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। আমীন।

সম্পাদক
মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী
পরিচালক, খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সিলেট।

بسم الله الرحمٰن الرحيم

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! মহান রাব্বুল আলামীনের অপরিসীম কৃপায় বহুতরের ফিতনার এ যুগে মাজহাব ও নামাযের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর এই গ্রন্থটি পাঠকদের হাতে আমরা তুলে দিতে পেরেছি। তাক্বলীদ ও মাজহাবের সঠিক ব্যাখ্যা, এর হাক্বিকাত ও সুন্নাত পদ্ধতিতে মাজহাবের শিক্ষানুযায়ী নামায আদায় ইত্যাদি বিষয়ের উপর সরল ভাষায় আলোচনা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

আজকাল অনেক মুসলমান ইবাদাতের ক্ষেত্রে তারতম্য দেখে সত্যিই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন। মাজহাব এবং তাক্বলীদ সম্পর্কে স্বল্প-জ্ঞাত অনেক মুসলমান এটা অনুধাবন করেন না যে, ইসলামে ঐতিহ্যবাহী ও সঠিক কয়েকটি বিশেষ উপাসনা পদ্ধতি আছে যা সবাইকে পালন করতে হয়। তারা বুঝতে পারেন না ও সময় সময় বিভ্রান্ত হন যখন নামায আদায়কালে দেখতে পান, ইমাম সাহেব ফাতিহা পাঠান্তে পার্শ্ববর্তী মুসল্লি সজোরে ‘আ-মিন’ বলছেন কিংবা রুকু থেকে দাঁড়িয়ে সিজদায় যাওয়ার পূর্বে হাত উত্তোলন করে তাকবীর দিচ্ছেন- অথচ একই সময় নিজে তা পালন করছেন না। তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এরা এভাবে নামায আদায় করেন কেন? তার নিজেরটা কি সঠিক নয়? এসব প্রশ্ন থেকে শেষ পর্যন্ত অপর মুসলিম মুসল্লি ভাইয়ের প্রতি বৈরি ভাবও সৃষ্টি হতে পারে। অনেক সময় নিজেরটা সঠিক কি না সেদিকে খেয়াল না রেখে অপরের নামায পড়াকে সঠিক নয়, বা এরা জানেন না, ইত্যাদি ধারণা জন্ম নেয়। আর এ থেকে সময় সময় তর্ক বিতর্কের সূত্রপাত ঘটতে পারে, তারা একে অন্যের নামায ও ইবাদাতকে কঠিন ভাষায় সমালোচনা শুরু করেন, যা কারোর জন্যই কল্যাণকর হতে পারে না। অপরদিকে কেউ কেউ অন্যের নামায পদ্ধতিকে বিনাপ্রশ্নে অনুসরণ করে থাকেন। ফলে নিজের মনে বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন জাগে- আমি হয়তো সারা জীবন ভুল পদ্ধতিতে নামায আদায় করে ফেলেছি!

নামাযে উপরোক্ত এসব পার্থক্যের আসল কারণ কী হতে পারে? এসব উপায় ও পদ্ধতির মধ্যে কোনো কোনোটি কি সঠিক নয় কিংবা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার বহির্ভূত? এছাড়া ঐতিহ্যবাহী ও সুপ্রতিষ্ঠিত প্রখ্যাত চার মাজহাব কি

মূল্যহীন বা অগ্রহণযোগ্য? এ চারটি ছাড়াও আরো কোন মাজহাব আছে কি, কিংবা এগুলোর মধ্যে একটা থেকে আরেকটার মূল্য কি মহান আল্লাহ পাকের নিকট অধিক শ্রেষ্ঠ?

উপর্যুক্ত প্রশ্নাবলীর জবাব এ প্রসঙ্গে আমরা কুরআন, হাদীস, চার মাজহাবের ইমাম তথা আইয়াম্মায়ে মুজতাহিদীন দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত থেকে উপস্থাপন করার চেষ্টা চালিয়েছি। বিশেষ করে 'হানাফী' মাজহাবের অনুসারী অসংখ্য মানুষের সুবিধার্থে আমরা এ মাহজাব অনুযায়ী নামায আদায়ের সুন্নাত পদ্ধতির উপর বিশদ আলোচনা করেছি। আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ, দয়া ও খাস ইচ্ছা এবং 'খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া' এর গবেষণা বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিজ্ঞ শূরা সদস্যবৃন্দ, আলিম ও সম্পাদকমণ্ডলীদের যৌথ প্রচেষ্টার ফলে এ গ্রন্থখানা আমরা পাঠকমহলে উপহার দিতে সক্ষম হয়েছি। বিশেষকরে মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী সাহেবের সুযোগ্য সম্পাদনা ও মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান সাহেবের একান্ত সহযোগিতা থেকে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আমাদের আশা ও দৃঢ় বিশ্বাস, এ কিতাবটি পাঠের পর 'মাজহাব' (مذهب), 'তাক্বলিদ' (تقليد) ইত্যাদির গুরুত্ব ও সঠিক সুন্নাত পদ্ধতিতে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে কারো মনে কোন ধরনের সন্দেহ থাকবে না। সর্বোপরি এ ব্যাপারে বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে আমরা মুক্ত হবো। আমরা আল্লাহর দরবারে তাওফিক কামনা করি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাঁর পছন্দসই সঠিক পদ্ধতিতে আমল করার তাওফিক দিন এবং তাক্বলিদের হাক্বিকাত ও গুরুত্ব অনুধাবনে সাহায্য করুন। আমীন।

গ্রন্থকার
ডিসেম্বর ২০১১ ঈসায়ী।

প্রথম পরিচ্ছেদ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

-"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূল এবং উলুল আমরদের অনুকরণ করো" (নিসা (৪) : ৫৯)।

তাক্বলিদ - ইসলামী শরীয়তে কোন বিশেষ পদ্ধতির অনুসরণ করা

'তাক্বলিদ' (تقليد) একটি আরবী শব্দ যার পারিভাষিক অর্থ হলো: অপরের কোন বক্তব্য বিনা দ্বিধা, প্রশ্ন ও প্রমাণ ছাড়া মেনে নেওয়া এ কথা বিশ্বাস রেখে যে, বক্তব্যটি প্রমাণ ও বাস্তবতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অর্থাৎ সঠিক হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ নেই।

আমরা সবাই তাক্বলিদের উপর নির্ভরশীল

তাক্বলিদ বা অপরকে সঠিক মনে করে তার কথায় বিশ্বাস রাখা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। আমরা যদি আমাদের মা-বাবা, শিক্ষক, মুরুব্বী প্রমুখের উপর তাক্বলিদ না করতাম তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকাও কঠিন হতো। আমাদের বাবা বলেছেন, এটা ভলো ওঠা খারাপ- আমরা তা সঠিক মনে করেছি। আমাদের উস্তাদ আমাদেরকে বলেছেন, এভাবে পড়, এ লেখার অর্থ এটা- এই অংকের সমাধান এরূপ ইত্যাদি- আমরা তা বিনা বাক্যে মেনে নিয়েছি ও তার কথামতো শিক্ষা করেছি। এভাবে চিন্তা করলে এটা সহজেই অনুমেয় হবে যে, তাক্বলিদ বা অপরের কথা ও কাজকে অনুসরণ ছাড়া কোন উপায় নেই। মানবসৃষ্টির শুরু থেকেই এভাবে মানুষ একে অন্যের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রেখে আসছে। বাস্তবে মানবতার বুদ্ধিগত উন্নয়নের মূল সূত্রই হচ্ছে এই অনুসরণ-অনুকরণ। আর এই বিশ্বাস ও অনুসরণ-অনুকরণের নামই হচ্ছে তাক্বলিদ।

তাক্বলিদের উপর আমরা কতটুকু নির্ভরশীল তার আরো দৃষ্টান্ত হলো সৈন্যদেরকে বিনা দ্বিধায় কমান্ডারের নির্দেশ মানা, সরকারী বিভিন্ন সংস্থা

সরকারের নির্দেশ মান্য করা, দেশের আইন-কানুন মেনে চলা ইত্যাদি। কোন দেশ বা জাতির মধ্যে উপরোক্ত ব্যাপার-স্যাপারে যদি মানুষ সবকিছু অমান্য শুরু করে এই বলে যে, এসব ব্যাপার সঠিক কি না তার প্রমাণ লাগবে, তাহলে উপায় কি হবে? দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কি আদৌ সম্ভব হবে? এককথায়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাক্বলিদ ছাড়া কোন উপায় নেই- আমাদের মানসিক, শারীরিক, আত্মিক, বুদ্ধিন্নোয়ন, একাডেমিক, নৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন এই তাক্বলিদের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ আমাদেরকে অবশ্যই উচ্চপর্যায়ের অথোরিটির নির্দেশ গ্রহণ এবং মান্য করতে হয়।

সুতরাং তাক্বলিদের জরুরত যে কতটুকু তা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। তবে ইসলামী শরীয়তের ক্ষেত্রে তাক্বলিদের ব্যাপারে দু'টি বিষয় আমাদের জানতে হবে। প্রথমটি হলোঃ 'উযুব বি'ল-যাত'- **وجوب بالذات** এবং দ্বিতীয়টি 'উযুব বি'ল-গ্বায়ের' –**وجوب بالغير**

প্রথমটির অর্থ হলো, এটা নিজেই 'অবশ্যকরণীয় ব্যাপার' - যেমন, ঐসব ব্যাপার যা ইসলামী শরীয়তে, 'ফরয', 'ওয়াজিব', 'হালাল' বা 'হারাম'। এসব ব্যাপার ইসলামী শরীয়তের মৌলিক দিক থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত। এটাকে আমরা প্রাইমারী ব্যাপার বলতে পারি।

দ্বিতীয়টি হলো, অবশ্যকরণীয় ব্যাপার যা 'বাহ্যিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল' - অন্যকথায়, ঐসব হালাল-হারাম জিনিস যার মূল কারণ হলো অন্যান্য ব্যাপার যা সরাসরি কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এটাকে আমরা সেকেন্ডারী অবশ্যকরণীয় ব্যাপার বলতে পারি।

এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ হলো, কুরআন ও হাদীস শরীফ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করা। সহীহ হাদীস শরীফে আছেঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত,

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ

-"আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমরা এমন একটি উম্মাহ যারা লিখেও না হিসাবও করে না" [বুখারী (১৭৮০), মুসলিম]।

হাদীসটি চাঁদ দেখার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এতে এটাই বুঝা যায় যে, কুরআন ও হাদীস শরীফ লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা যাবে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ইসলামের এই উভয় মৌলিক সূত্র লিখিতভাবে সংরক্ষণের বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং এ কারণে তা সংরক্ষিত হয়েছেও। অথচ এ ব্যাপারে কেউ কোন দিন প্রশ্ন করে নি যে, কুরআন ও হাদীস লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা উপরোক্ত হাদীসের পরিপন্থী! এছাড়া এগুলো সঠিক ও নির্ভুল হওয়ার ক্ষেত্রে কেউ কোন দিন প্রমাণের জন্য দাবীও জানায় নি।

সুতরাং কুরআন ও হাদীস শরীফ সংরক্ষণ হলো উযুব বি'ল যাত, যা শরীয়ত দ্বারা গুরুত্বহ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই জরুরতটি একান্ত অবশ্যকরণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখনও এই জরুরত বহাল আছে, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কুরআন ও হাদীস শরীফ এরূপ লিখিতভাবে সংরক্ষণ ছাড়া তা অক্ষত ও অপরিবর্তিত রাখা আদৌ সম্ভব নয়। আর এ কথাটি বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে- কারণ, হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে কুরআন শরীফ লিখিতভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন দাঁড়ায়- তা অবিকৃত রাখার জরুরত হেতু। আর এ কারণেই কুরআন ও হাদীস শরীফ লিখিতভাবে সংরক্ষণ 'ওয়াজিব' হয়েছে। এর ইতিহাস সকলের জানা। সুতরাং কুরআন ও হাদীস শরীফ যুগ যুগ ধরে সঠিক ও অক্ষত অবস্থায় লিখিতভাবে সংরক্ষণ পুরো উম্মাহর একটি অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যাপার। এভাবে লিখিতভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে বলে ঊযূব বিল-গ্বাইর। এটাও 'ওয়াজিব' হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। একইভাবে যেহেতু এর জরুরত অনস্বীকার্য তাই 'তাক্বলিদ' বা ইসলামী আইনী ক্ষেত্রে অপরকে অনুসরণ করা- ওয়াজিব হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এটা দ্বিতীয় ক্যাটাগরী বা ঊযূব বিল-গ্বাইর এর অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং তাক্বলিদের জরুরতের ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকার কারণ থাকতে পারে না।

এককথায়, পবিত্র কুরআন হাদীসে যেসব ব্যাপার সরাসরি নির্দেশিত হয়েছে, যার সত্যতা যাচাই-বাচাইয়ের প্রয়োজন নেই। এগুলো ফরয, ওয়াজিব ইত্যাদি হওয়া সুস্পষ্ট। এসব ব্যাপারকেই বলে ঊযূব বিল-যাত। অপরদিকে যেসব ব্যাপার কুরআন-হাদীসের আলোকে গবেষণা করে মুজতাহিদ মতলক ইমাম উদ্ভাবন করেছেন, তাকেই বলে ঊযূব বিল-গ্বাইর।

প্রথমটি কুরআন-হাদীসে সরাসরি নির্দেশাবলী থেকে প্রতিষ্ঠিত আর দ্বিতীয়টি কুরআন-হাদীসের আলোকে গবেষণার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মাসআলা-মাসাঈল। উলামায়ে কিরাম বলেছেন, শরীয়তের প্রায় ২০ লক্ষাধিক মাসআলা-মাসাঈল মূলত আইম্মায়ে মুজতাহিদীন অর্থাৎ মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতা চার মহাত্মন ইমাম কুরআন ও হাদীস শরীফ চয়ন করে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এর মধ্যে ১০ ভাগের ১ অংশ মাসাঈল ঊযূল বিল-যাত এর অন্তর্ভূক্ত। বাকী ৯ অংশই ঊযূব বিল-গ্বাই এর অন্তর্ভূক্ত। পরবর্তীতে আমরা মাসআলা-মাসাঈল আবিষ্কারের যোগ্যতা তথা মুজতাহিদ হওয়ার শর্তাবলীর একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করছি। এ থেকেই পাঠকরা অনুধাবন করতে পারবেন, কেন আজকের যুগে ইজতিহাদের যোগ্য কোন আলিম নেই। এমনকি আগের যুগের প্রসিদ্ধ মহাত্মন ইসলামী চিন্তাবিদরাও যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাক্বলিদ করেছেন। নীচে আমরা প্রসিদ্ধ ক'জন মহাত্মনের নাম উল্লেখ করছি।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (হানাফী), ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (শাফিঈ), ইমাম আবু হামিদ গায্যালী (শাফিঈ), ইমাম ইবনে আবদুল বার (মালিকী), ইমাম আবু যাকারিয়া নববী (শাফিঈ), ইমাম আবু বকর জাস্সাস (হানাফী), ইমাম ইবনে হুম্মাম (হানাফী), ইমাম আবু ইসহাক শাতিবী (মালিকী), ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (শাফিঈ), ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী (মালিকী), ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (হানাফী), ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (শাফিঈ), ইমাম ইবনে আবিদীন (হানাফী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। এছাড়া সিহা সিত্তার হাদীস সংকলক মহাত্মন মুহাদ্দীসিনে কিরাম অর্থাৎ ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম ইবনে মাজাহ ও ইমাম নাসাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম তাক্বলিদ করেছেন। অনুরূপ অন্যান্য হাদীস সংকলক মুহাদ্দীসিনে কিরামও তাক্বলিদ করে গেছেন। এ থেকে প্রমাণ হয়, এসব মহাত্মন গবেষকরাও একথা মেনে নিয়েছিলেন যে, তাঁরা নিজেরা মুজতাহিদ মতলক হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না।

ইজতিহাদের যোগ্য কারা?

আমাদের মহাত্মন চার ইমাম তথা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম হাম্বল রাহামাতুল্লাহি আলাইহিমের মধ্যে নিম্নোক্ত

মৌলিক যোগ্যতা ছাড়াও আরো অনেক গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। তাঁদের পর থেকে আজ পর্যন্ত অনুরূপ গুণসম্পন্ন কোন আলিম জন্ম নেন নি। তথাপি কিয়ামত পর্যন্ত উক্ত গুণাবলীসম্পন্ন কারো আগমন ঘটলে তাঁর জন্য তাক্বলিদ ওয়াজিব হবে না। মোটকথা ইজতিহাদের দরোজা বন্ধ হয় নি বটে, কিন্তু সঠিক যোগ্যতা ছাড়াও শরীয়ত কাউকে ইজতিহাদ করার অনুমতি দেয় নি। আজকের যুগে কেউ যদি ইজতিহাদের আশা পোষণ করেন তাহলে তার মধ্যে নিম্নোক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর পূর্ণ জ্ঞান থকাতে হবে। ইজতিহাদ কয়েকজন মিলে সম্ভব নয়। মুজতাহিদ একজনকেই হতে হয়। ব্যাপারটি বুঝার জন্য একটি মিছাল দেওয়া যায়। একটি গাধার মধ্যে অন্তত বিশটি বকরির সমপরিমাণ শক্তি বিদ্যমান। এখন ঐ গাধাটি যে পরিমাণ বোঝা বহন করতে সক্ষম হবে, সে পরিমাণ বোঝা সকল বকরি মিলে বহন করতে সক্ষম হবে না।

১. শরয়ী মাসআলা-মাসাঈলের বিধি-বিধান সংক্রান্ত কুরআন ও হাদীস শরীফের সকল আয়াত ও সকল হাদীস সনদসহ মুখস্ত থাকতে হবে।
২. পবিত্র কুরআনের আয়াত নাজিলের সময়, প্রেক্ষাপট, কারণ, উপলক্ষ ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে।
৩. কোন্ হাদীস কোন্ সময়, কোন্ প্রেক্ষাপট, উপলক্ষ এবং কারণে বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা।
৪. হাদীসের বর্ণনাকারীদের ইতিহাস জানতে হবে।
৫. কুনআন শরীফের কোন্ আয়াত অপর আরেক আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে এবং তার কারণ কি- তা-ও জানতে হবে।
৬. কোন হাদীস কোন্ কারণে অপর হাদীস দ্বারা রহিত হয়েছে তার উপর পূর্ণ জ্ঞান।
৭. কুরআন শরীফের একাধিক আয়াতের মধ্যে বৈপরিত্য দেখা দিলে তার সমাধান কিভাবে সম্ভব সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখতে হবে।
৮. হাদীস শরীফে অনুরূপ বৈপরিত্য দেখা দিলে তার সমাধান কিভাবে হবে তার উপর সঠিক পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে।

৯. উসূলে তাফসীর ও উসূলে হাদীসের উপর গভীর অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জন।

১০. মুজতাহিদ মতলক তথা চার ইমামের গবেষণার উপর গভীর জ্ঞান রাখতে হবে।

১১. আরবী ভাষার উপর ব্যাকরণসহ অর্থাৎ সরফ, নাহু, বালাগাত, মানতিক ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকতে হবে।

১২. আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান।

১৩. প্রাচীন আরবী সাহিত্যের উপর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান।

১৪. আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক দিক দিয়ে মুত্তাকী, পরহেজগার, ইবাদতগুজার, খোদাভীরুতা ইত্যাদি উত্তম গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে।

এখন, এটা আমাদেরকে ভাবতে হবে- বর্তমান এই চরম বিভ্রান্তির যুগে তাক্বলিদের গুরুত্ব আরো কতো বেশী। এ যুগের অধিকাংশ মানুষ ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান খুব অল্পই রাখেন। সুতরাং তাক্বলিদ ব্যাতীত শরীয়তের অনেক মৌলিক বিষয়ও তাদের পক্ষে সঠিকভাবে অনুসরণ মোটেই সম্ভব নয়। অথচ যে যুগে অধিকাংশ মানুষ ইসলামী শরীয়তের ব্যাপারে অনেকটা ওয়াকিফহাল ছিলেন সে যুগেও সবাই তাক্বলিক করে গেছেন। এর প্রমাণ আমরা পরবর্তীতে উপস্থাপন করবো। তাক্বলিদের অনুসরণ মানে কোন একটি মাজহাবকে মেনে নিয়ে তার অনুসরণ- আর আগের যুগের অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মনরা পর্যন্ত কোন না কোন মাজহাবপন্থী ছিলেন। মূলত তাক্বলিদ ছাড়া শরীয়তের বিভিন্ন ব্যাপার সঠিকভাবে বুঝা ও সে অনুপাতে পালন বা আমল করা একমাত্র 'ইজতিহাদ' করার ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। অথচ অতীতে ইজতিহাদ করার ক্ষমতাসম্পন্ন অর্থাৎ মুজতাহিদ পর্যায়ের অনেকে তাক্বলিদ করে গেছেন- তারা কোন না কোন ইমামের অনুসরণ করেছেন বলে অনেক প্রমাণ আছে।

কুরআন শরীফ থেকে তাক্বলিদের প্রমাণ

আমরা ইতোমধ্যে যুক্তির নিরিখে তাক্বলিদের গুরুত্ব বর্ণনা করেছি। দৈনন্দিন জীবনে তাক্বলিদ ছাড়া আদৌ কেউ সুষ্ঠুভাবে জীবন-যাপন করতে পারবেন না। একই কথা ইসলামী দ্বীন পালনের ক্ষেত্রেও সত্য। আর এই সত্যটি পবিত্র কুরআন-হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। একটু পরই আমরা হাদীস শরীফ থেকে তাক্বলিদের প্রমাণ উসস্থাপন করবো। পবিত্র কুরআন শরীফে এ ব্যাপারে কয়েকটি আয়াত আছে। এর মধ্যে দু'টি আয়াত এখানে তুলে ধরছি যা মুফাসসিরীনে কিরাম তাক্বলিদের প্রমাণ হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা নাহল এবং সূরা আম্বিয়ায় ইরশাদ করেন:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

-"জ্ঞানীদেরকে (আহলাজ জিকরি) জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে" (নাহল (১৬) : ৪৩ এবং আম্বিয়া (৭) : ২১)।

এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, দ্বীনের ব্যাপারে যদি কোন বিষয় কারো জানা না থাকে তাহলে তাকে এ বিষয়ে জ্ঞানবান ব্যক্তি (আহলে জিকির) তথা ফকীহ মুজতাহিদ ইমামের নিকট থেকে জেনে নিতে হবে। এভাবে জানা ও মানার নামই তাক্বলিদ তথা জ্ঞানবান ব্যক্তির সিদ্ধান্তকে বিনাপ্রশ্নে সত্য জেনে মানা ও এর উপর আমল করা (তাফসীরে মাদারুল হাক্ব, তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন)। অপর একটি আয়াতে করীমে 'আল্লাহ, তাঁর রাসূল কিংবা তাদের মধ্যে যারা দ্বীনের উপর পূর্ণ জ্ঞানবান তাদের অনুসরণের' কথা এসছে। সূরা নিসায় ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

-"তোমরা আল্লাহ ও রাসূল এবং উলুল আমরদের অনুকরণ করো" (নিসা (৪) : ৫৯)।

এই আয়াতে করীমেও 'উলুল আমর' দ্বারা ফকীহ মুজতাহিদ উদ্দেশ্য। সুতরাং এই উভয় আয়াত দ্বারা ফকীহ মুজতাহিদের তাক্বলিদ 'ওয়াজিব' হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে। রাইসুল মুফাসসিরীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা, হযরত মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখ মহাত্মন 'উলুল আমর' এর

অর্থ ফকীহ মুজতাহিদ (আইম্মায়ে মুজতাহিদীন) বলেছেন। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

হাদীস শরীফ থেকে তাক্বলিদের প্রমাণ

তাক্বলিদের গুরুত্ব সম্পর্কে একাধিক হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়। আমরা এখানে কয়েকটি হাদীস সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করছি।

عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ

-"আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত: (তিনি বলেন) মু'আজ ইবনে জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইয়ামনে আমাদের কাছে আসেন একজন শিক্ষক ও নেতা হিসেবে। আমরা তাঁর কাছে একব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যিনি মৃত্যুকালে [উত্তরাধিকার হিসেবে] এক মেয়ে ও এক বোন রেখে যান। তিনি সিদ্ধান্ত দেন যে, অর্ধেক সম্পদ মেয়ের হবে ও বাকী অর্ধেক বোনের।" [সহীহ বুখারী : ৬২৩৭]

উল্লেখ্য উপর্যুক্ত হাদীসটির বর্ণনাকাল হচ্ছে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশা। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ এ হাদীসটি থেকে কিছু ব্যাপার ব্যাখ্যা করা যায়।

১. তাক্বলিদের আমল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই হয়েছে। প্রশ্নকারী (হাদীসের বর্ণনানুযায়ী) হযরত জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর সিদ্ধান্তকে প্রমাণ ছাড়াই মেনে নিয়েছেন বা এর বিরুদ্ধে কোন পাল্টা প্রশ্ন করেন নি। তিনি হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর ব্যক্তিগত অবস্থান, সম্মান, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দিয়ে তাঁর দেওয়া ফাতওয়াকে বিনাবাক্যে মেনে নিয়েছেন।

২. স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর ফাতওয়াকে অগ্রাহ্য করেন নি। এছাড়া যারা তাঁকে অনুসরণ করেছেন তাদেরকেও সমালোচনা করেন নি।

৩. হাদীসটি (تقليد شخصى) তাক্বলিদে শাখসী [ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ব্যক্তির অনুসরণ] এর প্রমাণ হিসেবেও যথেষ্ট। হযরত জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামনী মুসলমানদের প্রতি দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক উপদেশ দেওয়ার জন্য প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। সুতরাং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে, ইয়ামানবাসীদেরকে দ্বীনের ক্ষেত্রে হযরত জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে অনুমতি দিয়েছিলেন, তা-ও সুস্পষ্ট।

ইমামের অনুসরণ সম্পর্কে রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে উল্লেখ করেছেন:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ونبيه ولائمة المسلمين وعامتهم

-দ্বীন হচ্ছে নসিহত (কল্যাণকামিতা), সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ ও আল্লাহর কিতাবের জন্য, তাঁর নবীর জন্য এবং **আইম্মায়ে মুসলিমীনের** (মুসলমানদের ইমাম) জন্য এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য। (নাসাঈ শরীফ)

ইমামের অনুসরণ না করলে পৃথিবীতে ফাসাদের সৃষ্টি হয়। একটি হাদীসে আছে:

وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ

- যে ইমামের অবাধ্যতা করলো এবং পৃথিবীতে ঝগড়া সৃষ্টি করলো সে পরিমিত রিজিক থেকে বঞ্চিত হলো।

দ্বীন পালনে ইমাম ও উস্তাদ কে হতে পারেন এ ব্যাপারে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রাহমাতুল্লাহি বলেন:

هذا الحديث دين ، فانظروا عمن تأخذون دينكم

-"হাদীস হলো দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত, সুতরাং হাদীস বা জ্ঞানার্জনের পূর্বে তুমি লক্ষ্য করো, কার কাছ থেকে দ্বীন শিক্ষা করছো।" (শামায়িলে তিরমিযী)

তাক্বলিদ না করার পরিণতি

তাক্বলিদের জরুরত মানবজীবনের প্রাত্যহিক কাজে-কর্মে যে একান্ত অবশ্যকর্তব্য তা আমরা ইতোমধ্যে যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছি। ইসলামী শরীয়তের ব্যাপারেও যে তা জরুরী সে ব্যাপারে উপর্যুক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এবার একটু ভেবে দেখা যাক, তাক্বলিদ না মানার পরিণতি কি হতে পারে।

আধুনিক যুগে এসে মানুষ ধার্মিকতার ক্ষেত্রে কতটুকু সঠিক রাস্তায় আছে কিংবা কতটুকু ধার্মিক তা পাঠকরা সহজেই অনুমান করতে পারছেন। এ যুগের মানুষের মধ্যে নবীজীর [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সুন্নাহকে সঠিকভাবে অনুসরণের ক্ষেত্রে ভীষণ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে মানুষের জীবন স্বার্থপরতা, দুর্নীতিপরায়ণতা, অতিলালসা, মিথ্যাবাদিতা এবং সঠিক পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত মহাত্মন উলামাকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশ ইত্যাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। মানুষ দ্বীনকে নিজের ইচ্ছেমাফিক ব্যবহার ও পালনের প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। সুতরাং তাক্বলিদে শাখসীকে উপেক্ষার ফলে দ্বীনের বিরাট ক্ষতি হবে- একথা এখন দিবালোকের মতো সত্য। কারণ, ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে অনেক এবং তা দিন দিন কিছু স্বার্থান্বেষী মহলের একগুয়েমীর কারণে বাড়ছে। তাক্বলিদে শাখসীর প্রতি অনীহার একটি বড় ধ্বংসাত্মক কুফল হলো ঐসব তথাকথিত স্বঘোষিত 'মুজতাহিদদের' আবির্ভাব। কেউ কেউ ভাবেন, তারা আগেকার দিনের বড় বড় ইমাম ও মুজতাহিদদের সমপর্যায়ের হয়ে গেছেন এবং তাক্বলিদ করা তাদের জন্য জরুরী নয়- তারা নিজেরাই ইসলামী শরীয়তের যাবতীয় বিষয় কুরআন-হাদীস চয়ন করে সঠিকভাবে বের করতে সক্ষম!

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, আজকাল কিছু দলভূক্ত ব্যক্তিবর্গ দাবী করে যাচ্ছেন যে, এ যুগেও ইজতিহাদ ও মুজতাহিদ হওয়া সম্ভব বা দরকার। কিন্তু বাস্তবে ইতিহাস স্বাক্ষ্য দিচ্ছে যে, চারটি মাজহাবই আমাদের জন্য দ্বীন পালনে যথেষ্ট। পঞ্চম আরেকটি মাজহাবের আদৌ প্রয়োজন নেই।

আসলে এরূপ কোন নতুন মাজহাব সৃষ্টিও সম্ভব নয়। এছাড়া আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের পরে আজ পর্যন্ত সমপর্যায়ের কোন মুজতাহিদ এবং বিশেষ করে মুজতাহিদ মতলকের জন্ম মুসলিম উম্মায় হয় নি। অথচ এরূপ পূর্ণ-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া 'ইজতিহাদ' সম্ভব নয়। সুতরাং ইজতিহাদের স্বপ্ন যারা দেখছেন তারা মূলত কল্পনার জগতে বাস করছেন বলেই মনে হয়। আর যারা গাইর মুকাল্লিদ তাদের ব্যাপারে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, যেহেতু তারা সবাই 'মুজতাহিদ' সুতরাং তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই! আল্লাহ পাক তাদের তথাকথিত 'যুক্তিনির্ভর' দ্বীন পালন থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

শরীয়তের ক্ষেত্রে তাক্বলিদের গুরুত্ব ঃ একটি প্রশ্নত্তোর

এখন আমরা তাক্বলিদের ব্যাপারে একটি প্রশ্নত্তোর তুলে ধরছি।

প্রশ্ন: কেউ কেউ বলেন, তাক্বলিদ [কোন বিশেষ ইমামের মাজহাবকে অনুসরণ] শরীয়তে না-জায়েয। তারা এ ব্যাপারে অনড় যে, যে কোন মুসলমানকে একমাত্র কুরআন-সুন্নাহ ছাড়া আর কিছুই অনুসরণ করতে নেই। তারা এটাও বলেন যে শরীয়তের ব্যাপারে কোন বিশেষ ইমামের অনুসরণ 'শিরক' পর্যায়ের দোষণীয় কাজ। তারা আরও দাবী করেন, হানাফী, মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাজহাব নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের দু'শ বছর পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং এসব মাজহাব নতুন সৃষ্টি বা 'বিদ'আত' ছাড়া আর কিছুই নয়। কেউ কেউ বলেন, সাধারণ মুসলমানদের জন্য উচিত সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে শরীয়তের দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করা এবং এ ক্ষেত্রে কোন ইমামকে অনুসরণ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। অনুগ্রহ করে বুঝিয়ে বলুন, এসব কথা কতটুকু সঠিক?

মুফতি তক্বি উসমানী কর্তৃক [সংক্ষেপিত] উত্তর

এরূপ ধারণা জন্ম নিয়েছে একটি জটিল-কঠিন বিষয় সঠিকভাবে না বুঝা বা ভুলবুঝাবুঝির কারণে। এ ব্যাপারে পুরো ব্যাখ্যা এ প্রসঙ্গে দিতে গেলে একটি বড় লেখার প্রয়োজন। তবে আমরা সংক্ষিপ্তাকারে মৌলিক কিছু ব্যাখ্যা তুলে ধরছি।

এটা সত্য যে, মৌলিকভাবে আমরা একমাত্র আল্লাহ পাককেই মানি। আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো নির্দেশ মেনে চালি না। এটা তাওহিদের যৌক্তিক প্রয়োজনও বটে। কিন্তু বাস্তবে আমাদেরকে আল্লাহর রাসূলের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] প্রদর্শিত পথ মেনে চলতে হবে। এর কারণ হলো, তাঁরই মাধ্যমে আল্লাহ পাক যাবতীয় নির্দেশনা মানবজাতির প্রতি প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আল্লাহর রাসূলের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সুন্নাহকে মানার অর্থ হলো স্বয়ং আল্লাহকেই মানা।

তবে, ব্যাপারটি এতো সরল নয়- কারণ, কুরআন ও সুন্নাহকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা ও বুঝা খুব কঠিন ও জটিল ব্যাপার। পবিত্র শরীয়তের উপর গভীর অধ্যয়ন ছাড়া এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং এ বিষয়ের উপর অর্ধ-শিক্ষিত কিংবা একেবারে অজ্ঞ কারো পক্ষে সকল ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কষ্মিনকালেও সম্ভব হবে না। যদি প্রত্যেক মুসলমানকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কুরআন ও সুন্নাহকে চয়ন করে নিতে হতো তাহলে তা অবশ্যই অসম্ভব ব্যাপার হতো। কারণ এর ফলে দ্বীনে হাজার ধরনের ব্যবদান, মতানৈক্য, ভুল সিদ্ধান্ত ইত্যাদি ঢুকে তা লণ্ডভণ্ড করে দিত। আসলে কোন একক অনুপযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ খোঁজ করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্যিই সুকঠিন কাজ হবে- বাস্তবে এটা হবে অসম্ভব কাজ। প্রথমত প্রত্যেককে আরবী ভাষাসহ এ সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর পারদর্শী হতে হবে- যা কোন কালেই সবার পক্ষে অর্জন সম্ভব হয় নি। সুতরাং এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে, কিছু লোক এসব জ্ঞানের উপর পারদর্শী হয়ে ওঠবেন আর অন্যরা তাদেরকে শরীয়তী সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করে সঠিক উত্তর জেনে নেবে। এই উপায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বয়ং আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে নির্দেশ দিয়েছেন:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون

"আর সমস্ত মু'মিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং

সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে” [৯ : ১২২]।

উপর্যুক্ত কুরআনের আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে, একদল মুসলমানদেরকে ইসলামী শরীয়াহর উপর জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং অন্যরা সকলে এদের নিকট থেকে জেনে নেবে ও সে অনুযায়ী আমল করবে। যদি কোন উপযুক্ত আলীমকে কেউ শরয়ী কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করে এবং সে আলীমের দেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমল করে তাহলে, কিভাবে অন্য কেউ এ ব্যাপারকে ‘শিরক’ করার সমতূল্য বলতে পারে এই কথার উপর ভিত্তি করে যে, লোকটি একজন মানুষ দ্বারা সিদ্ধান্তকৃত ব্যাপারকে আমল করেছে? অবশ্যই এরূপ প্রশ্ন করা হবে অবান্তর।

এভাবে প্রশ্ন করা যে সঠিক নয় তার কারণ অত্যন্ত সহজভাবেই বুঝা যাবে। বাস্তবে প্রশ্নকারী কোন মতেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি আনুগত্যতাকে বিসর্জন দেয় নি। আসলে তো সে এই আনুগত্যতা প্রতিষ্ঠার কারণেই সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য খোঁজ করছে। কিন্তু, সে নিজে শরীয়তের ব্যাপারে জ্ঞাত না থাকায় যেব্যক্তি এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ ও জ্ঞাত তার শরনাপণ্ন হয়েছে। তার উদ্দেশ্য তো আল্লাহকেই সঠিকভাবে মানা। সে মুফতি বা আলীমকে অনুরসণের উদ্দেশ্য হিসেবে নেয় নি, বরং একজন সঠিক ব্যাখ্যাতা হিসেবে মেনে নিয়েছে মাত্র। সুতরাং কোন্ যুক্তিতে এই জিজ্ঞেস করে জেনে নেওয়াকে কেউ ‘শিরক’ বলতে পারে?

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, তাক্বলিদ একটি অবশ্যকর্তব্য বিষয়। কারণ তাক্বলিদের অর্থ হলো: এক ব্যক্তি যে নিজে কুরআন ও সুন্নাহকে সঠিকভবে বুঝার ক্ষমতা রাখে না, সুতরাং সে কোন বিজ্ঞ আলীমের শরণাপন্ন হয়, যাকে প্রায়শই ‘ইমাম’ বা নেতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে; এবং সে এই ইমামের মতানুসারে শরয়ী ব্যাপারে আমল করে। সন্ধানী ব্যক্তি কখনো সেই ইমামকে অনুসরণের উদ্দেশ্য মনে করে না বরং শরয়ী ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞ ও সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য কাঙ্ক্ষিত যাতে করে তার আমলটি শরীয়তসম্মত হয়। আর শরীয়তসম্মত হওয়াই হলো আল্লাহকে খুশী ও রাজী করার একমাত্র উপায়। এরূপ সন্ধান ও বিনা প্রশ্নে ইমামের

সিদ্ধান্তকে মানা ও পালন করার নামই হলো ঐ ইমামের তাক্বলিদ। সুতরাং কোন্ যুক্তিতে জরুরী এই তাক্বলিদকে 'শিরক' বলা যায়?

বিজ্ঞ ইমাম ও মুজতাহিদরা তাঁদের পুরো জীবন ইজতিহাদের উপর কাটিয়েছিলেন। তাঁরা শরয়ী আইন-কানুন সন্ধান করে বের করে লিপিবদ্ধ করেছেন প্রত্যেকটির মূল সূত্র ও ব্যাখ্যানুসারে। এভাবে সংগ্রাহক ইমামের ব্যাখ্যানুসারে সংগ্রহিত শরয়ী আইন-কানুনকেই বলে 'মাজহাব' বা এই ইমামের 'ফিক্হ'।

সুতরাং একজন ইমামের 'ফিক্হ' বা মাজহাব শরীয়তের বাইরে কোন কিছু বা শরীয়ত বহির্ভূত কিছু নয়। বাস্তবে, তা হলো একজন বিশেষজ্ঞ ইমাম কর্তৃক শরীয়তের একটি বিশেষ ব্যাখ্যা মাত্র এবং একটি শরয়ী সংগ্রহ যার সূত্র হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ এবং এই ইমাম একটি বিশেষ পদ্ধতিতে শরীয়তের অনুসরণকারীদের জন্য তাঁর কর্তৃক ব্যাখ্যাত আইন-কানুন বিন্যস্ত করেছেন। সুতরাং যে কেউ কোন একটি মাজহাব অনুসরণ করে সে বাস্তবে কুরআন-সুন্নাহকেই সঠিকভাবে অনুসরণ করে; আর এ অনুসরণের কারণ হলো সে নিজে অপারগ থাকায় উক্ত মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমামকে সে সর্বাপেক্ষা বেশী হক্ব ও শরয়ী ব্যাপারে অভিজ্ঞ হিসেবে মনে করে। এক কথায়, সে তাঁর তাক্বলিদ করে।

এখন প্রশ্ন জাগে- তাহলে, ফিক্হ বা মাজহাবের মধ্যে ব্যবধান কেন? একই দ্বীনের ক্ষেত্রে একাধিক মাজহাব হওয়ারই বা কারণ কি? এর আসল কারণ হচ্ছে কিছু কিছু ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর ক্ষেত্রে একাধিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে যার প্রত্যেকটিই সঠিক হিসেবে সবাই মেনে নিয়েছেন। কারণ, প্রত্যেক ইমামের ব্যাখ্যাই প্রমাণ ও যুক্তির নিরিখে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। ব্যাপারটি আরো বুঝার জন্য আমাদেরকে দেখতে হবে যে, কুরআন শরীফে বর্ণিত শরয়ী ব্যাপার-স্যাপার মূলত দু'ধরনের।

প্রথমত কিছু ব্যাপার আছে যা সুস্পষ্ট ভাষায় কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যার ব্যাখ্যা শুধুমাত্র একটিই হতে পারে; অন্য কোন ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। দৃষ্টান্ত হলো, নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে তা ফরয হওয়ার ব্যাপারটি। এছাড়া শূকরের মাংশ ভক্ষণ ও জিনা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে কুরআন শরীফে এমন সুস্পষ্ট নির্দেশ এসেছে যে, এর একটি মাত্রই ব্যাখ্যা

সম্ভব- অর্থাৎ উপরে বর্ণিত উপায়ে তা ফযর কিংবা হারাম। এসব ক্ষেত্রে ইসলামের ইতিহাসের মধ্যে কোন কালেই কোন ধরনের মাতনৈক্যের সৃষ্টি হয় নি। সকল মাজহাবের ইমাম এসব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একমত। সুতরাং এগুলোর উপর ইজতিহাদ কিংবা তাক্বলিদেরও প্রয়োজন নেই। এছাড়া যারা কুরআন-সুন্নাহ পাঠ করে এসব আইন বুঝতে সক্ষম তাদের জন্য কোন বিজ্ঞ আলীমের শরণাপণ্ন হওয়ারও দরকার নেই।

দ্বিতীয়ত কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু নির্দেশনা বা আইন-কানুন লিপিবদ্ধ আছে যার সঠিক ব্যাখ্যা সাধারণভাবে দেওয়া কঠিন। এগুলোর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

১. পবিত্র সূত্রদ্বয়ে (অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস শরীফে) যেসব শব্দ-ব্যবহার হয়েছে তার একাধিক ব্যাখ্যা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা মহিলাদের ইদ্দত সম্পর্কে বলতে পারি। পবিত্র কুরআন শরীফে এ ব্যাপারে এই আয়াত নাজিল হয়েছে: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

-"এবং তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা [আবার অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে] তিনটি পর্যন্ত 'ক্বুরু' অপেক্ষা করবে" [২:২২৮]।

উক্ত "ক্বুরু" (قُرُوءٍ) শব্দটির দু'টি ভিন্ন অর্থ আছে। তাহলো মহিলাদের 'মাসিক হওয়ার কাল' ও 'পবিত্র হওয়ার কাল' [তুহর]। আয়াতে উভয় অর্থ গ্রহণযোগ্য এবং প্রতিটির আলাদা ব্যাখ্যা ও ফলাফল দাঁড়াতে পারে।

এখন প্রশ্ন হলো ব্যাখ্যাদাতাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে আয়াতে কোন অর্থটি উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর এ সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যাদাতাদের বা ইমামদের মধ্যে পার্থক্য থাকাটাও স্বাভাবিক- কারণ, উভয় অর্থই গ্রহণযোগ্য। সুতরাং ইমাম শাফিঈ যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তাহলো, 'পবিত্র হওয়ার কাল', কিন্তু ইমাম আবু হানীফা যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তাহলো, 'মাসিক বা হায়েজের কাল'। এটা মনে রাখা দরকার যে, উভয় ইমামের ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য- এক্ষেত্রে কারোর ব্যক্তিগত অভিমত অপরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলা বা মনে করার কোন অবকাশ নেই।

উপর্যুক্ত এই আলোচনা থেকে ইমামদের মধ্যে ভিন্নমত ও সে অনুযায়ী ভিন্ন মাজহাবের উৎপত্তির একটি কারণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠলো। এছাড়া আরোও কারণ আছে।

২. কোন কোন সময় একইভাবে হাদীস শরীফের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপারে দু'টি হাদীস খুঁজে পাওয়া যায়- যার উভয়টিই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এক্ষেত্রেও ইমাম তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করে দু'টির যে কোন একটি গ্রহণ করতে বাধ্য। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, যেটি তিনি গ্রহণ করেন নি তা সঠিক নয় বা অগ্রহণযোগ্য। আসলে উভয়টি একই সঙ্গে গ্রহণ করা অসম্ভব, তাই এ অবস্থার সৃষ্টি। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে ওঠবে।

হাদীস শরীফে নামাযের সময় রুকু অবস্থার সঠিক পদ্ধতি দু'টি ভিন্ন সহীহ হাদীসে পাওয়া যায়। এর প্রথমটি হলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে যাওয়ার পূর্বে দাঁড়ানো থাকাবস্থায়ই দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করেছেন। আর দ্বিতীয়টি হলো তিনি এরূপ হাত উত্তোলন করেন নি। এখন যে কোন ব্যাখ্যাদাতাকে উভয় বর্ণনাকে সঠিক হিসেবে মেনে নিয়েও যে কোন একটির উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। তারা এ ব্যাপারে অবশ্য বিভিন্ন অভিমতও পেশ করতে পারেন। সুতরাং এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এটা মোটেই নয় যে, এই মতানৈক্য মৌলিক- বরং উভয় মতের যে কোন একটিকে বাধ্য হয়ে গ্রহণ করতে যেয়ে এই মতানৈক্য।

৩. অনেক বিশেষ ব্যাপার আছে, পবত্রি কুরআন-হাদীসে যার সুস্পষ্ট কোন সমাধান নেই। এসব ব্যাপার এবং এর সমাধান বের করার পদ্ধতি হলো দু'টি: হয় অন্যটির সঙ্গে তুলনা করে না হয় বিভিন্ন গ্রহণযোগ্য সূত্র থেকে দৃষ্টান্ত খোঁজ করে। এখানেও বিজ্ঞ ইমামগণকে সঠিক সমাধান খুঁজতে যেয়ে ভিন্ন ধরনের পথ অবলম্বন করতে হয়েছে।

উপরোক্ত কারণসমূহের ফলে বিভিন্ন মাজহাবের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারতম্য ও মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। এসব তারতম্য কিন্তু কোন মতেই শরীয়তের মধ্যে বেজাল বা এ ধরনের কিছু আছে বলে প্রমাণ করে না। আসলে এগুলো হলো শরীয়তের মধ্যে কাঠিন্যতা বর্জনের মৌলিক সূত্র।

অন্যকথায় মূল সূত্র কুরআন-হাদীস থেকে শরীয়তের বিভিন্ন মাসআলা স্থান-কাল-পাত্র মুতাবিক সমাধানের একটি পন্থা কিয়ামত পর্য উন্মুক্ত থাকবে।

পরবর্তী প্রশ্ন হবে: "কোন এক ব্যক্তি এসব ভিন্ন মাজহাব নিয়ে কি করবে ও সে কোনটি অনুসরণ করবে?" এ প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত সহজ। চারটি মাজহাবই শরীয়তের সঠিক পন্থাবলম্বনে ব্রত ছিল এবং আছে- সুতরাং প্রতিটিই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য। যে কোন ব্যক্তি এই চারটি সুপ্রতিষ্ঠিত মাজহাবের যেটির প্রতি সে বেশী বিশ্বাস ও আস্থা রাখে সেটি অনুসরণ করতে পারে; এতে সে কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

যদিও অনেক প্রসিদ্ধ ইমাম ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন ও তা করেছেন কিন্তু এদের মধ্যে চারজন ইমাম ছিলেন যাদের ইজতিহাদ ছিল সর্বাপেক্ষা উন্নতমানের, গ্রহণযোগ্য, মূল্যবান ও পরিপূর্ণ। এদের মতো অন্য কেউ আর শরীয়তের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইজতিহাদী গবেষণা করতে পারেন নি। এই চার প্রসিদ্ধ ইমাম হলেন হযরত আবু হানীফা, হযরত মালিক, হযরত শাফিঈ, হযরত আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। বর্তমান কাল পর্যন্ত এদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মাজহাব থেকে উন্নতমানের বা ভালো কোন মাজহাব কেউ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। মুসলিম উম্মাহ যুগ যুগ ধরে এই চার মাজহাবকে শরীয়তের সঠিক ব্যাখ্যা হিসেবে মেনে নিয়ে আসছে। এই মাজহাবগুলোর নাম প্রতিষ্ঠাতা ইমামদের নামানুসারে হয়েছে হানাফী, মালিকী, শাফিয়ী ও হাম্বলী। আরো অন্যান্য স্কুল বা মাজহাব হয় অপূর্ণতা হেতু না হয় গ্রহণযোগ্যতার অভাবে ঠিকে থাকে নি। আর এ কারণেই উম্মার প্রায় সবাই কোন না কোন মাজহাবের অনুসারী। কেউ যদি কোন একটি বিশেষ স্কুল বা মাজহাবের অনুসরণ করে তাহলে এটা তার জন্য অবশ্যকরণীয় যে, সে তা সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে **'তাক্বলিদ'** এর সঠিক ব্যাখ্যা আশাকরি স্পষ্ট হয়েছে। এতে এটা নিরঙ্কুশভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি, তাক্বলিদের সঙ্গে **'শিরক'** এর কোন সম্পর্ক নেই। যারা এসব কথা বলে তারা ভ্রান্ত। তাক্বলিদ মূলত শরীয়তকে সঠিকভাবে অনুসরণের একমাত্র পন্থা। তাক্বলিদ ছাড়া তা কিছুতেই সম্ভব নয়। যারা বলে তাক্বলিদ শিরক বা

শরীয়তকে অনুসরণের ক্ষেত্রে তাক্বলিদের প্রয়োজন নেই, তারা নিজেরাই আসলে তাক্বলিদ করতে বাধ্য। কারণ, ইতোমধ্যে আমরা ওয়াকিফহাল হয়েছি, চার মাজহাব ছাড়া অন্য কোন মাজহাব আজ পর্যন্ত কেউ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় নি, যেটা সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা ও পূর্ণতা লাভ করেছে। তবে চেষ্টা যে হয় নি, তা কিন্তু মোটেই নয়। আজকে যারা তাক্বলিদের বিরোধিতা করেন তাদেরও অধিকাংশ বিশ্বাস বা শরয়ী অনুসরণ এই চার মাজহাবের এক বা একাধিক সামাধানের উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং চার মাজহাব ছাড়া অন্য কোন উপায়ে দ্বীন পালন সম্ভব নয়। যারা লা-মাজহাবী বলে নিজেদেরকে পরিচয় দিয়ে থাকেন তারাও মূলত প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় যে কোন এক বা একাধিক ইমামের মত ও পথ মেনে চলছেন। এরপরও যারা মাজহাব মানাকে অস্বীকার করেন, তারা হয়তো জাহিল না হয় নিমকহারাম। কারণ, কুরআন ও হাদীস মানাই হলো মাজহাব মানা, আর মাজহাব মানার অর্থই হলো কুরআন ও হাদীস মানা তথা শরীয়তকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করা।

কেন একটি মাত্র মাজহাব মানতে হবে

এবার আমরা প্রত্যেক শরয়ী ব্যাপারে 'একটি মাত্র মাজহাব মেনে চলার' কারণ উপস্থাপন করবো। এটা বুঝাতে যেয়ে আরেকটি প্রশ্নত্তোর এখানে তুলে ধরছি। এ প্রশ্নের জবাবদাতাও পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস মাওলানা তকী উসমানী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম।

প্রশ্নঃ সুন্নী মুসলমানরা সাধারণত বিশ্বাস করেন যে, চার (হানাফী, শাফিয়ী, মালিকী ও হাম্বলী) মাজহাবের প্রত্যেকটি- যেহেতু শরীয়তের সঠিক ব্যাখ্যা, যথাযথ ও কোনটিই শরীয়তের সঙ্গে বিরোধী ও সংঘাতময় নয়। কিন্তু আমরা একই সময় দেখতে পাই হানাফী মাজহাবের অনুসারীরা কখনও হানাফী সিদ্ধান্ত থেকে একটুও দূরে যেতে নারাজ- তারা কিছুতেই অন্য কোন মাজহাবের অনুসরণ করেন না। তারা বরং মনে করেন হানাফী হয়ে শাফিয়ী কিংবা মালিকী বা হাম্বলী মাজহাবের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া অগ্রহণযোগ্য। এটা কিভাবে মানা যায়, যেখানে প্রত্যেকটি মাজহাবই সঠিক বলে সবাই প্রচার করেন? সুতরাং এটা সহজেই অনুমেয় যে, প্রত্যেকটি মাজহাব যেহেতু সঠিক

তাই যে কোন একটি যে কোন ব্যাপারে অনুসরণ করলে তাতে কোন দোষ হওয়ার কথা নয়। ব্যাপারটি আরও বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিলে উপকৃত হবো।

উত্তর: এটা সত্য যে চারটি মাজহাবের প্রতিটিই হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া এটাও সঠিক যে, যে কোন একটির অনুসরণ করলেই হক্ব রাস্তায় বহাল থেকে শরীয়তকে সঠিকভাবে পালন করা যায়। কিন্তু কোন অযোগ্য আলীম বা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন মাজহাবী সিদ্ধান্ত থেকে 'পিক এন্ড মিক্স' [তুলে নেওয়া ও মিশ্রণ] এরূপ করা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ এটা একমাত্র ব্যক্তিগত 'ইচ্ছে' পুরণের জন্য হয়ে থাকে। অথচ দু'টি কারণে এভাবে 'পিক এন্ড মিস্ক' সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

প্রথমত আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালামে একাধিক আয়াতে ইরশাদ করেন, শরীয়তকে অনুসরণ কর ও ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে বর্জন কর।

পবিত্র কুরআন শরীফে আছে:

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

-অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হিদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। (২৮:৫০)

অন্য আয়াতে আছে:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

-আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার জিম্মাদার হবেন? (২৫:৪৩)

শরীয়তের সূত্রদ্বয় পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফকে মুসলিম ব্যাখ্যাতারা কখনও নিজেদের ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্য বানান নি। ব্যক্তিগত সুবিধার্তে তারা কখনও শরীয়তের আইনকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালান নি। তাদের একমাত্র

উদ্দেশ্য ছিল শরীয়তের হাক্বিকাতকে সবার জন্য উন্মুক্ত ও সহজ করা। এখন, কোন অযোগ্য ব্যক্তি যদি শরীয়তের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে তাহলে সে অবশ্যই নিজের স্বার্থ ও ইচ্ছার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যাপার চয়েজ করবে। কিন্তু এরূপ করা হবে কুরআন শরীফের নির্দেশের বিরোধিতা। কারণ আল্লাহ পাক বার বার বলছেন, তোমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে চলো না। এখন এক দু'টো দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। এতে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠবে।

ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সিদ্ধান্ত হলো শরীরের যে কোন অংশ থেকে রক্ত যদি ফোটা ধরে ঝরে পড়ে তাহলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। অপরদিকে ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সিদ্ধান্ত হলো, রক্তঝরা দ্বারা ওযু নষ্ট হয় না। এছাড়া ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, কোন পুরুষ যদি ওযু অবস্থায় কোন মহিলাকে স্পর্শ করে তাহলে তার ওযু নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, শুধুমাত্র স্পর্শ দ্বারা লোকটির ওযু নষ্ট হবে না। এখন ভেবে দেখুন 'পিক এন্ড মিস্ক' এর পরিণতি কি হতে পারে? একজন সাধারণ ব্যক্তি মনে করবে যেহেতু প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তই সঠিক তাই এ ক্ষেত্রে সুযোগ মতো উভয় ইমামকে অনুসরণ করা যায়। যেমন, ওযু অবস্থায় মহিলাকে স্পর্শ করার ক্ষেত্রে সে হানাফী মতামতের অনুসরণ করলো [সুতরাং তার ওযু নষ্ট হলো না] আর অপরদিকে, রক্তঝরার ক্ষেত্রে সে শাফিঈ মতামতের অনুসরণ করলো [সুতরাং এ ক্ষেত্রেও তার ওযু নষ্ট হলো না!]। এতে প্রমাণ হলো উভয় অবস্থার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও তার ওযু নষ্ট হলো না। অথচ উভয় মতামতের মধ্যে ওযু নষ্ট হওয়ার ব্যাপারটি পরিষ্কার- তাই চালাকি করে লোকটি ওযু নষ্ট হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে দিল! কিন্তু আসলে উভয় ক্ষেত্রেই তো তার ওযু নষ্ট হওয়ার কথা। কারণ উভয় ইমাম ওযু নষ্ট হওয়ার কথা বলেছেন। এক ক্ষেত্রে এক ইমাম আর অপর ক্ষেত্রে আরেকজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে অপবিত্র হয়েও পবিত্র থেকে যাওয়ার দাবী করে বসলো! অর্থাৎ তার নাফসানী ইচ্ছাকে পূরণ করলো, যা পবিত্র কুরআনে বার বার নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এরূপ করা কি তার পক্ষে সঠিক হবে? কিছুতেই নয়।

আরেকটি দৃষ্টান্তা হলো, শাফিয়ী মতে মুসাফির ব্যক্তি যুহর ও আছরের নামায একই সঙ্গে পালন করতে পারে। কিন্তু একই সময় কোন ভ্রমণকারী যদি নিয়ত করে যে বিশেষ কোন স্থানে সে চারদিন অবস্থান করবে তাহলে সে আর শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসাফির হিসেবে গন্য হবে না। সুতরাং সে আর ক্বসর নামাযের জন্য যোগ্য থাকবে না, অথবা একই সঙ্গে যুহর ও আছরের নামাযও পড়তে পারবে না। সে মুক্বিম হয়ে যাবে। এটা হলো শাফিয়ী মতামত। কিন্তু হানাফী মতে ভ্রমণকারী চৌদ্দদিন পর্যন্ত কোন এক স্থানে থাকলেও মুসাফির হিসেবে গন্য হবে এবং তার নামায হবে ক্বসর। তার এই অবস্থা বহাল থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিয়ত থাকবে যে সে এই স্থানে চৌদ্দ দিনের অধিক অবস্থান করবে না।

সুতরাং কোন এক ভ্রমণকারী যদি এক শহরে ৫ দিনের বেশী অবস্থানের নিয়তে প্রবেশ করে তাহলে তার পক্ষে যুহর ও আছর একই সঙ্গে পালনের কোন পথ উভয় মাজহাব অনুযায়ী খোলা থাকবে না। কারণ, ইমাম শাফিঈর মতে সে যেহেতু চার দিনের বেশি থাকবে তাই সে মুসাফির হিসেবেই গন্য হবে না এবং ইমাম আবু হানীফার মতে উভয় নামায একই সঙ্গে পড়ার অনুমতি নেই। তবে যদি 'পিক এন্ড মিক্স' এর অনুমতি থাকে তাহলে যে কোন ব্যক্তিকে, নামায পালনের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে পালনের জন্য হানাফী মতে মুসাফির থেকে শাফিয়ী মত গ্রহণ করে নিতে পারে! কারণ শাফিয়ী মতে একই সঙ্গে ক্বছর আদায়ের (এবং উভয় নামায একসঙ্গে পালনের) শর্ত হলো মুসাফির হওয়া। বাস্তবে অনেকে এভাবে করে থাকে বলে প্রমাণ আছে। কিন্তু এরূপ করা তো সম্পূর্ণরূপে নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণের পন্থা ছাড়া আর কি হতে পারে? অথচ আমল-ঈমানের ব্যাপারে, নিজের সুবিধার উপর এভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া কিন্তু শরীয়তে নিষিদ্ধ।

সুতরাং আমরা একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, বিভিন্ন মাজহাবের মতামতের উপর ভিত্তি করে যদি কেউ শরয়ী সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তা হবে নিজের স্বার্থভিত্তিক ব্যাপার। এরূপ করা আসলে স্বয়ং শরীয়ত ও মাজহাবগুলো নিয়ে তামাশা ছাড়া আর কিছু নয়। এভাবে করার পেছনে নিয়তের গলত ও নফসের ইচ্ছা ক্রিয়াশীল থাকে। সুতরাং শরীয়তে এভাবে 'পিক এন্ড মিস্ক' এর ভিত্তিতে মাজহাব অনুসরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যে

কোন ব্যক্তির জন্য চার মাজহাবের যে কোন একটিমাত্র অনুসরণ করতে হবে। অন্যথায় পুরো উম্মার মধ্যে শরয়ী ক্ষেত্রে নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব বা অরাজকতার সৃষ্টি হবে- যা অবশ্যই কারো কাম্য হতে পারে না।

উপরোক্ত কারণসমূহের ফলে পরবর্তী ইমামরা কোন একটি মাত্র মাজহাব অনুসরণ ওয়াজিব বলে মতামত পেশ করেছেন। যদি কেউ ইমাম আবু হানিফার মাজহাব পছন্দ করে তাহলে তাকে শরীয়তের প্রত্যেকটি ব্যাপারে এই মাজহাবের আইন-কানুন ও মতামত পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করে চলতে হবে। কিন্তু কেউ যদি অন্য কোন মাজহাব পছন্দ করে তার জন্য সেটা পূর্ণাঙ্গভাবে মেনে চলতে হবে। বিভিন্ন মাজহাবের ভিন্ন মতামত কারো পক্ষে 'পিক এন্ড মিস্ক' (তুলে নেওয়া ও মিশানো) কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

মাজহাবের ক্ষেত্রে সুবিধা হলো যে কোন ব্যক্তি যে কোন একটি অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু কোন একটির উপর বিশ্বাস স্থাপনের পর অন্য আরেকটির আইন-কানুন ও সিদ্ধান্তকে মানা তার জন্য আর সঠিক হবে না। এখানে একথা আবারো পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন আলীমের জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ কোন মুজতাহিদকে [ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলে মুজতাহিদ] বিশেষ কোন মাজহাব অনুসরণের প্রয়োজন পড়ে না- যদিও অনুসরণ করায় কোন ক্ষতি নেই। একজন মুজতাহিদ শরীয়তের যে কোন মাসআলা মূল পবিত্র সূত্রদ্বয় (কুরআন-হাদীস) থেকে খুঁজে বের করার যোগ্যতা রাখেন।

আরেকটি ব্যাপার এখানে তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি। আধুনিককালে একটি ব্যাপার দিন দিন প্রকট হচ্ছে, তাহলো কিছু জেনারেল শিক্ষিত লোকের আবির্ভাব ঘটছে যারা ইসলামের উপর সঠিক জ্ঞান না রেখেও শরয়ী এবং মাজহাবের ব্যাপারে ভিন্ন মতামত অহরহ মিডিয়া ও অন্যান্যভাবে প্রকাশ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছেন। এদের অধিকাংশ মূল সূত্রের ভাষা আরবীর উপর গভীর জ্ঞান রাখেন না, অন্য ভাষায় অনূদিত সংকলন থেকে জ্ঞানার্জন করে তাদের ব্যক্তিগত মতামত পেশ করে যাচ্ছেন। অথচ শুধুমাত্র আরবীর উপর জ্ঞানই এরূপ মন্তব্যের জন্য যথেষ্ট নয়। ইসলামী বিভিন্ন বিষয় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর গভীর অধ্যয়ন ছাড়া ইজতিহাদের সমপর্যায়ের কোন মন্তব্য অগ্রহণযোগ্য। এদের অনেকেই তথাকথিত -'শিক্ষিত' সমাজের লোক। এদের

স্পর্ধা এ পর্যন্ত বেড়ে গেছে যে, তারা আগের যুগের ইমাম ও মুজতাহিদদের সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা ও এমনকি কটুক্তি করতেও দ্বিধা করেন না! এ অবস্থার মূলে অজ্ঞতা কাজ করছে এবং এটা কোন মতেই মেনে নেওয়া যায় না।

পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফ থেকে শরয়ী কোন আইন খুঁজে বের করা চাট্টিখানি কথা নয়। শরীয়তের বিরাট জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে ব্যাপারটি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত, ব্যাখ্যা ইত্যাদি সবকিছু প্রথমে খুঁজে দেখতে হবে। উসূলে হাদীস এর উপর ভিত্তি করে হাদীস শরীফে বর্ণিত ব্যাপারটির উপর গবেষণা চালাতে হবে। এছাড়া কুরআন-হাদীসের তথ্যের ঐতিহাসিক কারণ খুঁজে বের করে তা পরীক্ষা করতে হবে। মোটকথা, শরয়ী একটিমাত্র ফাতওয়াহ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোন এক ব্যক্তিকে প্রাথমিক কিছু জটিল ব্যাপার নিয়ে গভীর গবেষণা করা জরুরী। আর এটা করার পূর্বশর্ত হচ্ছে বিষয়ের উপর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান। সুতরাং যারা শরীয়ত ও মাজহাব নিয়ে ভিন্নমত লিখতে, বলতে, প্রচার করতে ইচ্ছুক তাদের উচিত প্রথমে নিজের যোগ্যতার উপর ভালোকরে তাহক্বিক করা। অন্যথায়, তাদের মতামত হবে অপূর্ণ, বিভ্রান্তিকর ও সার্বিকভাবে পুরো উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর।

তাক্বলিদের উপর আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা এটাই বুঝতে সক্ষম হলাম যে, ইজতিহাদী যোগ্যতা ছাড়া তাক্বলিদ শুধু জরুরী নয়, একান্ত অবশ্যকরণীয় ব্যাপার। অন্যথায় শরীয়তের বিভিন্ন ব্যাপার সঠিকভাবে বুঝা ও পালন করা সম্ভব নয়। আর এটাও আশাকরি পরিষ্কার হয়েছে যে, চার মাজহাবের প্রতিটিই পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক শরীয়ত। এর যে কোন একটি কেউ যদি অনুসরণ করে তাহলে তার জন্য যথেষ্ট হবে। একই সঙ্গে একাধিক মাজহাব অনুসরণ গ্রহণযোগ্য নয়। আর মাজহাব অনুসরণ ছাড়া পথভ্রষ্টতার বিরাট আশঙ্কা আছে। যারা মাজহাব মানাকে কটুক্তি করে ও এ ব্যাপারে বিতর্কের প্রয়াস পায় তারা ভ্রান্ত। কারণ মাজহাব মানার অর্থ কোন মতেই কুরআন-হাদীস ছাড়া ‘ইমামের অনুসরণ’ নয় বরং ইমাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শরীয়তকে অনুসরণ যা ইজতিহাদী যোগ্যতা ছাড়া নিজে নিজে অনুসরণ কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়া এটাও আশারাখি স্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষ যদি কোন বিশেষ স্কুল

বা মাজহাবের অনুসরণ না করে তাহলে পুরো উম্মাহর মধ্যে শরীয়তের ক্ষেত্রে [সুতরাং ইবাদাত-বন্দেগী ও প্রাত্যহিক জীবনচলার পথে] অরাজকতার সৃষ্টি হবে। মাজহাব মানা তাই 'ওয়াজিব' হিসেবে সিদ্ধান্ত হয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে বুঝার তাওফিক দিন। আ-মিন।

একনজরে মাজহাব মানার গুরুত্ব

এখন আমরা সবার সুবিধার জন্য মাজহাব মানার গুরুত্ব অতি সংক্ষেপে তুলে ধরছি। আমরা আশাকরি এ থেকে সকলেই উপকৃত হবেন।

১. মাজহাব মান্য করা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম।
২. চার ইমামের মাজহাবের যে কোন একটি মানা ওয়াজিব।
৩. মাজহাব মানার মাধ্যমেই সঠিকভাবে দ্বীন পালন সম্ভব।
৪. মাজহাব মানার অর্থ কুরআন-সুন্নাহর সঠিক অনুসরণ।
৫. মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতা মুজতাহিদ মতলক চার ইমামবৃন্দ কুরআন-হাদীস চয়ন করে সকলের জন্য আল্লাহর পছন্দসই দ্বীন পালনের পন্থা উদ্ভাবন করে গেছেন। তারা নতুন দ্বীন আবিষ্কার করেন নি।
৬. একমাত্র মাজহাব মানার মাধ্যমেই আল্লাহর হুকুম ও সন্তুষ্টি লাভ হয়।
৭. মাজহাব মানার অর্থ সীরাতুল মুসতাক্বীমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা।
৮. কুরআন-হাদীস মানার নামই মাজহাব মানা। আর মাজহাব মানার নামই কুরআন-হাদীস মানা।
৯. দ্বীন সঠিকভাবে অনুসরণের ক্ষেত্রে মাজহাব সর্বসাধারণের জন্য সবকিছু সহজ-সরল করেছে।
১০. চার মাজহাবের মধ্যে সামান্য মতানৈক্য 'রহমত' হিসাবে মনে করা হয়। মুসলিম উম্মার মধ্যে কোন কালেই অনৈক্যের কারণ মাজহাব ছিলো না এবং হবেও না। বরং চারটি মাতমত থাকায় দ্বীন পালন মুসলমানদের জন্য সহজ হয়েছে।

মাজহাব না মানার কুফল

এবার আমরা মাজহাব না মানার কয়েকটি কুফল নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরছি।

১. মাজহাব ছাড়া সঠিকভাবে আল্লাহর হুকুম পালন অসম্ভব।
২. মাজহাব না মানলে আল্লাহর পছন্দসই দ্বীন পালন সম্ভব হয় না।
৩. মাজহাব ছাড়া সঠিকভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা মানা সম্ভব হয় না।
৪. মাজহাব না মানলে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে যায়।
৫. দ্বীন পালনে মতানৈক্য ও অরাজকতার সৃষ্টি হয় কারণ, মাজহাব না মানার অর্থ সবাইকে 'মুজতাহিদ' হতে হবে! অর্থাৎ নিজে নিজে কুরআন- হাদীস চয়ন করে মাসআলা-মাসাঈল বের করতে হয়। যা আদৌ সম্ভব নয়।
৬. মাজহাব না মানলে 'নফসে আম্মারা' থেকে সৃষ্ট খাহিশাত পূরণের দিকে মানুষ ঝুকে পড়ে, যা পবিত্র কুরআন-হাদীসে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
৭. মাজহাব না মানলে দ্বীন পালনে বিদআতের রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, যা কুরআন-হাদীসে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হানাফী মাজহাব সম্পর্কে দু'টি প্রশ্ন ও তার সঠিক জবাব

কিতাবের শেষ অংশে আমরা হানাফী মাজহাব মুতাবিক নামাযের নিয়ম-কানুন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। ইতোমধ্যে মাজহাব অনুসরণের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা বিশদ ব্যাখ্যা কুরআন-হাদীসের আলোকে করেছি। মাজহাব অনুসরণ করার শর্ত হলো তাক্বলিদ। তাক্বলিদের অর্থ ও গুরুত্ব নিয়েও পাঠকদের অবগত করা হয়েছে।

হানাফী মাজহাব মুতাবিক সুন্নাত পদ্ধতিতে নামায আদায় যে মূলত পবিত্র কুরআন-হাদীসের সঠিক অনুসরণ তা প্রমাণ করার ক্ষেত্রে আমরা এখানে নিয়ম-কানুনই শুধু তুলে ধরছি না- এসাথে প্রত্যেকটি নিয়মের পেছনে যেসব সহীহ হাদীস শরীফ আছে সেগুলোও বর্ণনা করবো।

আজকাল মানুষ আমল-ঈমানের ক্ষেত্রে ভীষণ দুর্বল থাকাসত্ত্বেও একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল মাজহাব সম্পর্কে কিছু অহেতুক প্রশ্ন তুলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে যাচ্ছে। এসব প্রশ্নের মধ্যে দু'টি অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে মনে করি।

প্রশ্ন ১. এরা জিজ্ঞেস করে, "আপনি কি ইমাম আবু হানীফার অনুসারী না হযরত রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বীনের অনুসারী?'

যে কোন ব্যক্তি এ প্রশ্নের জবাবে বলতে বাধ্য: "আমি অবশ্যই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বীনকে অনুসরণ করি"।

উত্তর সঠিক হলেও প্রশ্নের মধ্যে যে লুকিয়ে আছে মাজহাব বিরোধী কটুক্তি তা আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই! জবাবকারীর পক্ষ থেকে সঠিক জবাব পাওয়ার পরই কিন্তু আরো ভীষণ বিভ্রাকির দ্বিতীয় প্রশ্নটি তারা করে।

প্রশ্ন ২. তখন তারা পাল্টা জিজ্ঞেস করে বসে: "আপনি নিজেকে তাহলে হানাফী বলে পরিচয় দেন কেন?"

এখন, এই দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে যে কোন সাধারণ ব্যক্তি ভীষণ বিভ্রান্তিতে পড়ে যেতে বাধ্য। আর ঐসব লা-মাজহাবী গোষ্ঠির উপরোক্ত প্রশ্নবাণের উদ্দেশ্যও হলো মানুষকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের ভ্রান্ত

মতবাদ প্রচার করা। মাজহাব কী এবং কেন, এ ব্যাপারে অন্তত ন্যূনতম জ্ঞান ছাড়া কেন 'হানাফী, মালিকী, শাফিয়ী বা হাম্বলী?' এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সুকঠিন বটে। সুতরাং পথভ্রান্ত ঐসব মাজহাব বিরোধীরা সাধারণ মানুষের এই দুর্বলতাকে খুব সফলভাবে ব্যবহার করে যাচ্ছে। তাদের এসব প্রশ্নের ফলে সাধারণ ব্যক্তির মনে সন্দেহের জন্ম নেয়। এরপর ঐ বিভ্রান্তি ও সন্দেহের বেড়াজালে আবদ্ধ ব্যক্তি ক্রমে তাদের পথভ্রষ্টতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সে তখন তাক্বলিদ থেকে দূরে সরে যায়- অর্থাৎ মাজহাবকে সে আর মানে না। এই করুণ অবস্থা আজকাল দ্রুত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষ মাজহাবের জরুরত ও তাক্বলিদের হাক্বিক্বাত কি তা আর বুঝতেই চায় না। তারা মনে করে কুরআন-হাদীসের অনুসরণ করছে- সঠিক পথে বহাল আছে, কিন্তু বাস্তবে যে বিরাট ক্ষতির মধ্যে পতিত হচ্ছে সে ব্যাপারে তারা মোটেই ওয়াকিফহাল নয়। এখানে একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। এ থেকে পাঠকরা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন, ক্ষতির মাত্রা কী পরিমাণে যেয়ে পৌঁছেছে।

এ ব্যাপারটি খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগের অন্যতম গবেষক মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমার এক পরিচিত যুবক এসে বললো, দয়া করে আমার মা-বাবার জন্য দু'আ করুন, তারা দ্বীন থেকে সরে পড়েছেন, তারা হানাফী হয়ে গেছেন! আমি তার কথায় অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, কী বলছো, সঠিক রাস্তায় তো তারাই আছেন, তুমি না পথভ্রষ্ট হয়ে গেছ, লা-মাজহাবীদের খপ্পরে পড়ে।

উপর্যুক্ত ব্যাপারটি দ্বারা এটাই প্রমাণ হলো যে, লা-মাজহাবীরা দ্বীন সম্পর্কে অপরিপক্ক নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত সমাজকে টার্গের করে কাজ করছে। আর ইতোমধ্যে উল্লেখিত প্রশ্নদ্বয়ের মাধ্যমে একদল লোক এই শতকে এসে অসংখ্য মানুষের মনে একটি ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দেওয়ার প্রয়াস পাচ্ছে। আর এটা হলো, আপনি যদি হানাফী হয়ে থাকেন তাহলে আপনি আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দ্বীনকে অনুসরণ করছেন! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দ্বীনকে নয়! কিন্তু এ কথাটি সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক, বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক ও ইমাম হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম নিজেরা কোন দ্বীন আবিষ্কার করেন নি। তাঁরা বরং সর্বক্ষেত্রে এক ও একটি মাত্র দ্বীন-

যে দ্বীন হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সঠিক অনুসরণ করেছেন। সুতরাং তাদেরকে যারা অনুসরণ করে তারাও সঠিকভাবে সত্য দ্বীনকে অনুসরণ করে- এতে কোন সন্দেহ নেই।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, আমাদেরকে কেন কোনো বিশেষ ইমামের অনুসরণ করা জরুরী? এ প্রশ্নের জবাব আংশিকভাবে গ্রন্থের প্রথমাংশে হয়ে গেছে। এরপরও আমরা আরোও কিছু ব্যাখ্য উপস্থাপন করবো যাতে মানুষের মনে ইমাম অনুসরণের ব্যাপারটি সঠিকভাবে জানা হয়ে যায়।

উক্ত প্রশ্নের জবাব পাল্টা আরো কিছু প্রশ্ন দ্বারা বুঝা সহজ হবে: "আপনি কি দ্বীনের যাবতীয় আইন-কানুন, মাসআলা-মাসাইল ও নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন? আপনি কি ওযুর সঠিক নিয়ম কুরআন-হাদীস ও অন্যান্য সূত্র থেকে সঠিকভাবে বের করার ক্ষমতা রাখেন? আপনি কি জানেন কোন হাদীস দ্বারা অপরটি রহিত হয়েছে? আপনি কি একই বিষয়ে একাধিক বিরোধী হাদীসের মধ্য থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষমতা রাখেন? আপনি কি জানেন কুরআন শরীফের কোন আয়াতের অর্থ সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য ও কোনটি অন্য আয়াত দ্বারা রদবদল বা রহিত হয়েছে? ইত্যাদি ... ইত্যাদি।"

এখন যদি কেউ এসব যাবতীয় বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান রাখে না তখন সে কিভাবে দ্বীনকে সঠিকভাবে অনুসরণ করবে? সে কোথায় গিয়ে দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞানার্জন করে সঠিকভাবে ইবাদাত-বন্দেগী করে দুনিয়া-আখিরাতের জীবনকে ধন্য করবে? হ্যাঁ, এরূপ ব্যক্তির প্রতি উদ্দেশ্য করেই কুরআন শরীফের এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

-"যারা জানে তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করো, যদি তুমি জানো না।" [১৬:৪৩]

সুতরাং, যেহেতু কুরআন ও হাদীস শরীফ থেকে দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে যে বিরাট জ্ঞানের প্রয়োজন তা আমাদের নেই, তাই উপরোক্ত নির্দেশানুযায়ী আমাদেরকে যে-ব্যক্তি এসব ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন, তার

শরণাপন্ন হতেই হবে। আর ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন এদের মধ্যে অন্যতম।

প্রশ্ন জাগতে পারে তিনি যেহেতু এ পৃথিবীতে নেই তাই তার কাছ থেকে কিভাবে আমরা জানবো? এর জবাব হলো, তিনি সবকিছু প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন লিখিতভাবে ও সরাসরি শিক্ষাদানের মাধ্যমে যার সিলসিলা এখনও জারী আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেও। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা কর্তৃক দ্বীনের যাবতীয় সঠিক আইন-কানুন কেউ অনুসরণ করতে চাইলে এখনই পারে- ও এতে সে সঠিক রাস্তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। একই কথা অন্যান্য ইমামের বেলাও সত্য। আর যদি কেউ এ অংশের শুরুতে উদ্ধৃত ঐসব বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের ফাঁদে পড়ে পথহারা হয়ে যায়, তাহলে তার বিরাট ক্ষতির আশঙ্কা আছে। আমরা আল্লাহর পবিত্র দরবারে আশ্রয়প্রার্থী।

ইমাম আবু হানীফা ছিলেন প্রসিদ্ধ একজন তাবিঈ। প্রায় ৪০০০ উস্তাদের সান্নিধ্যে থেকে তিনি হাদীস অধ্যয়ন করেন। তার আমল এতোই উচ্চ পর্যায়ের ছিল যে, দীর্ঘ ৪০ বছর তিনি ফযরের নামায আদায় করেছেন ইশার ওযু দ্বারা। অর্থাৎ এ দীর্ঘদিন তিনি সারারাত ইবাদাতের মধ্যে কাটিয়েছেন। তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও আমল-ঈমানের ব্যাপ্তি এতো বেশী ছিল যে, সেযুগের সকল বিজ্ঞ ইমাম ও ইসলামী চিন্তাবিদরা একবাক্যে তাঁকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানবান ওলিআল্লাহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। সুতরাং এরূপ উচ্চ পর্যায়ের প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির পক্ষে যে কুরআন-হাদীস থেকে দ্বীনের সঠিক ব্যাখ্যা বেরিয়ে আসতে পারে, সে ব্যাপারে কেউ কোন দিন সন্দেহ করেন নি।

একজন ইমাম বা গাইডের অনুসরণ করার আরেকটি কারণ হলো পবিত্র কুরআনের এই আয়াত:

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

-"এবং তাদের রাস্তা অনুসরণ করো যারা আমার দিকে ফিরে এসেছে" [৩১:১৫]।

আল্লাহর দিকে 'ফেরা'র ক্ষেত্রে দু'টি মৌলিক বিষয় গুরুত্ববহ: এক. জ্ঞান ও দুই. এই জ্ঞান মুতাবিক আমল। এ উভয় ক্ষেত্রে চার মহাত্মন ইমামরা ছিলেন উঁচু দরজার অধিকারী। ইমাম আবু হানীফা তাঁর সময়কার সকল

উলামা কর্তৃক স্বীকৃত সর্বোচ্চ জ্ঞানবান ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উস্তাদ হযরত মক্কী বিন ইব্রাহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ছাত্র। ইমামে আজম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'কিতা-বুল আছা-র' নামক একটি হাদীস গ্রন্থ সংকল করেছিলেন, যার মধ্যে মোট হাদীস সংখ্যা ছিল ৪০,০০০। সুতারং এরূপ কোন ইমামকে যে অনুসরণ করবে, সে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকেই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুসরণ করবে। এতে কোন সন্দেহ নেই।

আমরা গ্রন্থের প্রথমাংশে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্যের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখানে আরোও কিছু ব্যাখ্যা তুলে ধরবো যাতে পাঠকদের নিকট ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মতামতের মধ্যে পার্থক্যের কারণ বুঝার জন্য আমরা এখানে একটি ঘটনা তুলে ধরছি।

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি যুদ্ধশেষে মদীনা মুনুওয়ারায় শুধুমাত্র ফিরে এসেছেন, ঠিক তখনই তিনি সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমকে নির্দেশ দিলেন, বনু কুরাইজাহ গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানে যেতে হবে। এ ইহুদি গোত্রটি মদীনা মুনুওয়ারার বাইরে বসতি স্থাপন করেছিল। মুসলমানদের সঙ্গে যে অঙ্গীকার তারা করেছিল তা তারা ভঙ্গ করার ফলে তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযানের প্রয়োজন পড়ে। গোত্রটিকে অবরুদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ হয়। বনু কুরাইজায় দ্রুত পৌঁছার গুরুত্ব বুঝাতে যেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমকে বললেন: "বনু কুরাইজায় পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত কেউ আছরের নামায আদায় করবে না।"

সাহাবায়ে কিরাম বনু কুরাইজায় পৌঁছার পূর্বেই কিন্তু আছরের নামযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। এমতাবস্থায় একদল সাহাবা সাথে সাথে আছরের নামায আদায় করে নিলেন আর অপর আরেকদল আছর রাস্তায় না পড়েই বনু কুরাইজায় গিয়ে পৌঁছে সেখানে নামায আদায় করলেন। এতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় প্রথম দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ অমান্য করেছেন আর দ্বিতীয় দল করেন নি। কিন্তু আসলে উভয় দলই

নির্দোষ। কারণ প্রথম দল মনে করেছেন, 'আছর সেখানে গিয়ে পড়ো' এ কথাটির উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত বনু কুরাইজায় পৌঁছার উপর গুরুত্বপ্রদান মাত্র। অন্যদিকে দ্বিতীয় দল এ কথাটির শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করে সেখানে গিয়ে নামায আদায় করেছেন যদিও এতে কিছু দেরী হয়েছে। উভয় দলই যে সঠিক আমল করেছেন তার প্রমাণ মেলে তখন- যখন ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জানা হলো। তিনি এ ব্যাপারে উভয় দলের কাউকেই কিছু বললেন না। অর্থাৎ উভয়ের আমলেরই সমর্থন জানালেন।

সুতরাং ব্যাখ্যার কারণে মতানৈক্য সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু ব্যাখ্যাতাকে অবশ্যই উচ্চ পর্যায়ের ফকীহ হতে হবে। দ্বীনের ক্ষেত্রে যে কোন ব্যক্তি কোন বিষয়কে ব্যাখ্যা করে যদি মতানৈক্যের সৃষ্টি করার প্রয়াস পায় তাহলে তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। মতানৈক্যের আরও কিছু কারণ আছে যা আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। এর মধ্যে একটি হলো একই ব্যাপারে ভিন্ন হাদীস শরীফ। সুতরাং এক ইমাম হয়তো একটি হাদীসের উপর গুরুত্ব বেশী দিয়েছেন আর অপরজন অপরটির উপর। তবে এসব মতানৈক্য কিন্তু মৌলিক আক্বীদার ক্ষেত্রে হয় নি- এগুলো মূলত ইবাদাতের পদ্ধতি তথা আমলের ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

কেন একজন মাত্র ইমামের অনুসরণ করতে হবে, তার ব্যাখ্যা আমরা ইতোমধ্যে তুলে ধরেছি। এখন এ ব্যাপারে যা বলার তাহলো পরবর্তী যুগের উলামার মধ্যে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, "যে কোন একজন মাত্র ইমামের অনুসরণ সবার জন্য ওয়াজিব।" তাঁর অনেক পূর্বে ইমাম রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও একই মন্তব্য করেছেন।

হানাফী মাজহাব মুতাবিক নামায নিয়ে আলোচনার পূর্বে একটি বিষয় সবার অবগতির জন্য এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি।

আজকাল অনেকেই মনে করেন কোন হাদীস সঠিক ও নির্ভুল হওয়ার জন্যে তা 'বুখারী' বা 'মুসলিম' শরীফে থাকতে হবে। এটা আসলে একটি ভুল ধারণা। বাস্তবে হাদীস শরীফের নির্ভুলতা নির্ভর করে এর বর্ণনাকারীদের উপর; তা সিহা সিত্তা বা ছ'টি প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীসগ্রন্থে থকুক বা অন্য কোন সংকলনে থাকুক। ইমাম মুসলিম তাঁর মুকাদ্দিমায় (ভূমিকায়) লিখেছেন, তিনি

তাঁর সংকলনে (মুসলিম শরীফে) যাবতীয় সহীহ হাদীস লিপিবদ্ধ করেন নি। আসলে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের মতে তাঁদের উভয় সংকলনের মোট সংখ্যার অধিক সহীহ হাদীস আছে যা সংকলনদ্বয়ে লিপিবদ্ধ হয় নি। সুতরাং বুখারী/মুসলিম বা সিহা সিত্তা ছাড়া অন্যান্য হাদীস সহীহ নয়, এরূপ মনে করা আদৌ ঠিক নয়।

হানাফী মাজহাব সরাসরি পবিত্র কুরআন-হাদীস থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একই কথা অন্যান্য মাজহাবের ক্ষেত্রেও সত্য। তবে হানাফী মাজহাব ও হাদীস শরীফের মধ্যে সম্পর্ককে সঠিকভাবে অনুভব করতে হলে কিছু হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়নের প্রয়োজন আছে। যেমনঃ ১. শরাহ মা'আনিল আছহা-র, ২. আল-জাওয়াহিরুন নাক্বিয়া, ৩. নুসবুর রা-ইয়াহ, ৪. ই'লাউস-সুনান, ৫. বাযলুল মায-হূদ, ৬. ফাতহুল মুলহিম, ৭. আওযাজুল মাছা-লিক ও ৮. আছহা-রুস সুনান ইত্যাদি।

হানাফী মাজহাবপন্থী মানুষের সংখ্যা সর্বাধিক। কিন্তু আজকাল কিছু লোক বিভিন্ন নামধারী একদল গ্বাইর মুক্বাল্লিদ [তাক্বলিদ যারা করে না তাদেরকে বলে গ্বাইর মুক্বাল্লিদ, আর যারা করে তারা হলো মুক্বাল্লিদ] লোকদের অনুসরণ করে পথভ্রষ্ট হচ্ছে। আসলে এসব গ্বাইর মুক্বাল্লিদের অনুসরণও এক ধরনের তাক্বলিদ! এসব গ্বাইর মুকাল্লিদ নিজেদেরকে মুহাম্মদিয়া, আহলে হাদীস ও সালাফী হিসেবে পরিচয় দান করে। তারা দাবী করে একমাত্র তারাই সহীহ শরীয়তের অনুসারী, তারাই কুরআন-হাদীস সঠিকভাবে অনুসরণ করে ইত্যাদি। এরাই কিন্তু মানুষকে 'ইমাম আবু হানীফার দ্বীন' অনুসরণ করছো বলে ধিক্কার ও কটুক্তি করে। আমরা এদের খপ্পর থেকে বাঁচার নিমিত্তে এই গ্রন্থটির অবতারণা করেছি। ইনশাআল্লাহ, পাঠকরা এটা পাঠ করার পর এই ভ্রান্ত লোকদের প্রশ্নের সমোচিত জবাব দিতে সক্ষম হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযের ফাজাইল ও গুরুত্ব

হানাফী মাযহাব মুতাবিক কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নামাযের উপর আলোচনা আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে তুলে ধরেছি। এ পরিচ্ছেদে পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফ থেকে কিছু বর্ণনা লিপিবদ্ধ করছি। এ থেকেই পাঠকরা নামাযের গুরুত্ব, জামাআতে নামায আদায়ের তাগিদ, নামাযের মাহাত্ম্য ও ফজিলত সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।

পবিত্র কুরআন শরীফে নামায প্রসঙ্গ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

-"আর নামায কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয় [অর্থাৎ জামাআতের সঙ্গে নামায আদায় করো]।" (২:৪৩)

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ

-"আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায ঠিক রাখবে, এবং রাতের প্রান্তভাগে, পূণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক।" (১১:১১৪)

উক্ত আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং নামাযের দ্বারা পাপ মোচনের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

-"হে আমার পালনকর্তা! আমাকে নামায কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও হে আমাদের পালনকর্তা, এবং কবুল করুন আমাদের দু'আ।" (১৪:৪০)

এই আয়াতে নিজে নামায কায়েক করা ও সন্তানাদিদেরকেও নামাযী হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

-"নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।" (২৪:৫৬)

এখানে নামায ও যাকাত হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ও সুন্নাত মুতাবিক পালন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

-"আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামায কায়েম করুন; নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে, আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ; আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর।" (২৯:৪৪-৪৫)

উক্ত আয়াতমালায় কুরআন তিলাওয়াত এবং নামায নিয়মিত পালনের নির্দেশ এসেছে। আর নামায যে মানুষকে অশ্লীলতা ও গুনার কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে তার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। তবে নামায হতে হবে কামিল তথা পরিপূর্ণ সুন্নাত মুতাবিক। এছাড়া আল্লাহর জিকিরের মাহাত্ম্যও বর্ণিত হয়েছে। আর নামাযও মূলত আল্লাহর জিকিরের অন্তর্ভুক্ত।

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

-"তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে, এটাই সঠিক ধর্ম।" (৯৮:৫)

এই আয়াতে পাকে মু'মিনের যাবতীয় ইবাদাত যে খাঁটি মনে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় অর্থাৎ ইখলাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে পালন করতে হবে, তার উপর ইরশাদ হয়েছে।

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

-"ধৈর্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে- অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন; কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষে (তা কঠিন) নয়।" (২:৪৫)

উক্ত আয়াতে করীমে ধৈর্য ও নামাযের সাথে আল্লাহর সাহায্য কামনা করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতে এই নামাযের ফলাফল হিসেবে স্বয়ং নিজেই নামায পালনকারীর সাথী হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। সুবহানাল্লাহ!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

-"হে মু'মিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চিতই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" (২:১৫৩)

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

-"সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে, আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও।" (২:২৩৮)

এই আয়াতে পাকের প্রথমে পাঁচ ওয়াক্তের নামায গুরুত্ব ও ইহতিমামের সাথে আদায় করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর 'সালাতুল উসতা' নামাযের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করেছেন। অধিকাংশ মুফাসসিরীনে কিরাম 'সালাতুল উসতা' এর অর্থ আছরের নামায বলেছেন। সবশেষে 'ক্বা-নিতীন' শব্দ দ্বারা 'নীরবতা, আদব ও খুজুখুশুর' সাথে নামাযে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

-"অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যখন নিশ্চিন্ত হয়ে যাও, তখন নামায ঠিক করে পড়। নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।" (৪:১০৩)

উক্ত আয়াতে করীমের শেষে আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত ওয়াক্তে নামায আদয় করা মুসলমানদের জন্য ফরয হিসাবে সাব্যস্ত করে দিয়েছেন।

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

-"আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিযিক চাই না, আমি আপনাকে রিযিক দেই এবং আল্লাহ ভীরুতার পরিণাম শুভ।" (২০:১৩২)

উক্ত আয়াতে করীমে নিজে নামাযের উপর অটল থেকে পরিবার পরিজনকে নামাযের জন্য নির্দেশ প্রদানের সুফল হিসাবে স্বয়ং আল্লাহ

তা'আলাই রিজিককে প্রশস্তভাবে দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এছাড়া নামায পালনে আল্লাহর প্রতি ভয় থাকার পরিণাম শুভ বলেছেন।

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا

-"অবশ্যই মুনাফিকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে, বস্তুত: তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায়, আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।" (৪:১৪২)

উক্ত আয়াতে অলসভাবে লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে নামাযে দাঁড়ানোকে মুনাফিকী বলা হয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুটি ও তাঁর স্বরণের উদ্দেশ্যে নামায আদায় করতে হবে।

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

-"অতঃপর তাদের পরে এল একদল অপদার্থ, পরবর্তীরা তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে।" (১৯:৫৯)

এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো যারা নামায বরবাদ করবে এবং নফসানী খাহেশাতের অনুগামী হবে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى

صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

-"মু'মিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র; যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত, যারা যাকাত দান করে থাকে। এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে। এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকে। এবং যারা তাদের নামাযসমূহের খবর রাখে। তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা শীতল ছায়াময় উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ করবে, তারা তাতে চিরকাল থাকবে।" (২৩:১-১১)

উক্ত আয়াতমালা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাকবুল মু'মিনদের আলামত বর্ণনা করেছেন। যেসব মু'মিনের মধ্যে এসব গুণাবলী থাকবে তারা ইহকালে কামিয়াব হবেন এবং পরকালে জান্নাতুল ফিরদাউসে আল্লাহ তা'আলা তাদের মেহমানদারীর প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। সংক্ষেপে এসব গুণাবলী হলোঃ ১. নামায বিনয়-নম্রতার মাধ্যমে আদায় করা; ২. অনর্থক কথাবার্তা ও কাজ থেকে বিরত থাকা; ৩. যাকাত যথাযথভাবে আদায় করা; ৪. নিজের লজ্জাস্থানের হিফাজত করা; ৫. পাঁচ ওয়াক্ত নামায গুরুত্বসহ আদায় করা; ৬. আমানতে খিয়ানত না করা এবং ৭. ওয়াদা রক্ষা করা।

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ

-"অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর; যারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে।" (১০৭: ৪-৬)

এই পবিত্র আয়াতমালায় আল্লাহ তা'আলা নামাযীদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, যারা নামাযের মধ্যে অসতর্ক এবং লোক-দেখানো নামাযে অভ্যস্ত তাদের ইহ-পরকাল উভয়টি ধ্বংস হবে।

নামায সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস

নামাযের গুরুত্ব, ফজিলত ও মাহাত্ম্যের উপর পবিত্র হাদীসেও অসংখ্য বর্ণনা আছে। আমরা নিম্নে মাত্র কয়েকটি সহীহ হাদীস তুলে ধরছি।

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ইসলামের ভিত্তি হলো পাঁচটি: (১) এটা স্বাক্ষ্য প্রদান, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাস আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, (২) নামায প্রতিষ্ঠা করা, (৩) যাকাত আদায় করা, (৪) হজ্জ পালন করা এবং (৫) রমজান শরীফে রোযা রাখা।" (সহীহ বুখারী, মুসলিম)

উক্ত হাদীস শরীফে প্রথমেই কালেমার কথা উল্লেখিত হয়েছে। এর কারণ হলো, ঈমানই সবকিছুর ভিত্তি।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِي حَدِيثِ بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا

-হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "তোমরা ভেবে দেখ, তোমাদের কারোর ঘরের দরজায় যদি একটি নদী প্রবাহিত হতে থাকে এবং সে তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা-আবর্জনা থাকবে কি?" সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম জবাব দিলেন, না, তার শরীরে কোন ময়লা-আবর্জনা থাকবে না। তিনি বললেন, "পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের এটাই হচ্ছে দৃষ্টান্ত। এ নামাযগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পাপ মোচক করে দেন।" (সহীহ বুখারী, মুসলিম)

উক্ত হাদীস দ্বারা এটাও বুঝানো হয়েছে যে, গোসল যতো বেশী ঘষে-মেজে সঠিকভাবে করা হবে শরীরের ময়লাও ততো বেশী দূর হবে। অনুরূপ নামায যতো কামিল তথা সঠিক হবে গুনাহও ততো বেশী মুছে যাবে।

ولا تتركوا الصلاة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد خرج عن الملة (طب – عن عبادة بن الصامت)

-হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করবে না, কেননা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করে, সে দ্বীন হতে বের হয়ে যায়।" (তাবারানী)

যেহেতু দ্বীনদারির অর্থই হলো আল্লাহর ফরয আইন-কানুন মানা এবং পালন করা। সুতরাং নামায ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে স্বভাবতই দ্বীনদারির মধ্যে কমতি হয়ে গেল। জ্ঞাতব্য বিষয় যে, হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এরূপ ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হবে না ঠিক, কিন্তু নামাযকে সরাসরি অস্বীকারকারী কাফির হয়ে যাবে।

وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ

-হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামায ত্যাগ করো না। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামায ত্যাগ করে তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার কোন জিম্মাদারী থাকে না।" (মুসনাদে আহমদ)

উক্ত হাদীসে 'জিম্মাদারী থাকে না' কথাটি বিরাট গুরুত্ববহ। ভাবার ব্যাপার যে, যার উপর আল্লাহর জিম্মাদারী থাকে না তার ইহ ও পরকাল কিরূপ জঘন্য হতে পারে। আমরা আল্লাহর দরবারে ফানাহ চাই।

عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

-হযরত নাওফাল ইবনে মু'আবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তির এক ওয়াক্তের নামায ছুটে গেল, তার যেনো পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সবকিছু লুটপাট হয়ে গেল।" (মুসনাদে আহমদ)

নিজের আপনজন ও ধন-সম্পদ যেরূপ লুটপাট হয়ে গেলে মানুষ বড় বিপদে পড়ে যায়, ঠিক তদ্রূপ এক ওয়াক্ত নামায ছুটে গেলে দুনিয়া-আখিরাতে মানুষ বড় বিপদের সম্মুখীন হবে।

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر)

-হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি শরীয়তসম্মত ওজর ব্যতীত ২ ওয়াক্তের নামায একসঙ্গে পড়লো, সে কবীরা গুনার দরজাসমূহের মধ্য হতে একটিতে প্রবেশ করলো।" (সুনানে তিরমিযি শরীফ)

উক্ত হাদীসে '২ ওয়াক্তের নামায একসঙ্গে পড়লো' বলতে আগের এক ওয়াক্ত নামায কাযা হওয়াকে বুঝাচ্ছে। আর শরীয়তসম্মত ওজর ব্যতীত নামায কাযা হওয়া কবীরা গুনাহ। আর তাওবা ছাড়া কবীরা গুনাহ মাফ হয় না। জানা থাকা দরকার, জাহান্নামে যাওয়ার জন্য একটিমাত্র কবীরা গুনাহ যথেষ্ট, যদি না আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ

- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, একদিন হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সম্পর্কে আলোচনাকালে ইরশাদ করলেন, "যে ব্যক্তি গুরুত্বসহ নামায আদায় করলো, তার এই নামায কিয়ামতের দিন নূর হবে, হিসাবের সময় দলীল হবে এবং নাযাতের উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি গুরুত্বসহ নামায আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন এই নামায তার জন্য নূর হবে না, দলীলও হবে না এবং নাযাতের উপায়ও হবে না। এরূপ লোকের হাশর হবে ফিরাউন, হাম্মাম ও উবাই ইবনে খালাফের সঙ্গে।" (মুসনাদে আহমদ)

উক্ত হাদীস শরীফে নূরের অর্থ হলো, যখন বান্দা গুরুত্বসহ নামায আদায় করে তখন তা চৌদ্দই রাতের চাঁদের মতো একটি নূরের আকার ধারণ করে আকাশের দিকে উঠে যায়। এটা আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে থাকে, হে আল্লাহ! আমাকে সে অতি সুন্দরভাবে আদায় করেছে, তাই তাকে ইহ-পরকালে মঙ্গল দান করুন। অন্যদিকে যে এভাবে নামায আদায় করলো না, তার এই নামায কালো রংয়ের আকার ধারণ করে তার জন্য বদ-দু'আ করতে থাকে। আর

এই উভয়ের দু'আই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য। নামায আদায় না করলে কাফির, মুশরিকদের সঙ্গে হাশর হবে। এর অর্থ বিনা হিসাবে জাহান্নামী হতে হবে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ أَوْ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

-হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "নামায ছেড়ে দিলে মানুষ শিরকের বা কুফরের সাথে মিশে যায়"। (সহীহ মুসলিম)

এই হাদীস দ্বারা এটাই বুঝানো হচ্ছে যে, নামায ছেড়ে দেওয়ার কাজ আর মুশরিক ও কাফিরদের কাজের মধ্যে পার্থক্য নেই।

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَأَخَذَ مِنْهَا غُصْنًا يَابِسًا فَهَزَّهُ حَتَّى تَحَاتَّ وَرَقُهُ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا عُثْمَانَ أَلَا تَسْأَلُنِي لِمَ أَفْعَلُ هَذَا قُلْتُ وَلِمَ تَفْعَلُهُ فَقَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَأَخَذَ مِنْهَا غُصْنًا يَابِسًا فَهَزَّهُ حَتَّى تَحَاتَّ وَرَقُهُ فَقَالَ يَا سَلْمَانُ أَلَا تَسْأَلُنِي لِمَ أَفْعَلُ هَذَا فَقُلْتُ وَلِمَ تَفْعَلُهُ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُّ هَذَا الْوَرَقُ وَقَالَ { وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ }

-আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি হযরত সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাথে একটি গছের নীচে বসা ছিলাম। তিনি ঐ গাছের একটি শুকনো শাখায় ধরে নাড়া দিলেন। এর ফলে এ থেকে অনেক পাতা ঝরে পড়লো। এরপর তিনি আমাকে বললেন, হে আবু উসমান! তুমি আমাকে কেন জিজ্ঞেস করলে না, আমি কোন্ কারণে এরূপ করলাম? আমি বললাম, বলুন আপনি

কেনো এরূপ করলেন? তিনি জবাব দিলেন, আমি একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি গাছের নীচে ছিলাম। তিনি তখন গাছের শুকনো ডাল ধরে এমনভাবে নাড়া দিলেন, ফলে গাছের অনেক পাতা ঝরে পড়লো। এরপর তিনি আমাকে বললেন, "হে সালমান! আমি এরূপ করার কারণ তুমি কেনো জিজ্ঞেস করছো না?" আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলুন আপনি কেনো এরূপ করলেন? তিনি জবাব দিলেন, "হে সালমান! যখন কোন মুসলমান ভালোভাবে ওযু সেরে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে তখন তার পাপসমূহ এমনভাবে ঝরে পড়ে, ঠিক যেরূপ এসব পাতা ঝরে যায়।" এরপর তিনি কুরআন শরীফের এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন (আক্বিমুস সালাত .... ১১:১১৪)। অর্থাৎ, "দিনের উভয় অংশ ও রাতের একাংশে নামায কায়িম করো। নিশ্চয় নেক আমল পাপকে দূর করে দেয়। এটা নসীহত গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ।" (মুসনাদে আহমদ, নাসাঈ, তাবারানী)

উক্ত হাদীস থেকে আমরা এ শিক্ষাই পাচ্ছি যে, নামায দ্বারা সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আর ইস্তিগফার পাঠের সময় যদি কেউ তাওবার শর্ত অনুযায়ী নিয়ত রেখে তা পাঠ করে, তাহলে কবীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة

-"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি নামাযে মনোনিবেশ হতেন।" (ফাতহুল বারী)

এই হাদীস দ্বারা এটাই বুঝাচ্ছে যে, আল্লাহর কাছ থেকে কোন সঠিক সমাধান পেতে হলে সর্বোত্তম পথ হলো নামাযের মাধ্যমে তাঁর পবিত্র দরবারে আবদার করা। এ নামাযের নামই হলো 'সালাতুল হাজত' বা প্রয়োজন পূরণের নামায।

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي

-হযরত আবু ক্বাতাদা ইবনে রিবঈ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি আপনার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি এবং প্রতিজ্ঞা দিয়েছি, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মতো গুরুত্বসহ আদায় করবে আমি তাকে নিজ দায়িত্বে জান্নাতে প্রবেশ করবো। আর যে ব্যক্তি গুরুত্বসহ এসব নামায আদায় করবে না, তার ব্যাপারে আমার কোন দায়িত্ব নেই।" (হাদীসে কুদসী, ইবনে মাজাহ)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى لِلّٰهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ

-হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন ইখলাসের সাথে তাকরীবে উলাসহ নামায আদায় করবে, সে দু'টি উপকার লাভ করবে: ১. জাহান্নাম থেকে নাযাত এবং ২. মুনাফিকী থেকে মুক্তি।" (সুনানে তিরমিযি)

উক্ত হাদীস শরীফে চল্লিশ দিন এক নাগাড়ে জামাআতের সহিত নামায আদায়ের মাধ্যমে বান্দার যে কতো বিরাট উপকার হাসিল হয় তা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এখানে জাহান্নাম থেকে নাযাত ও মুনাফিকী খাসলত থেকে মুক্তি কথা দু'টো বিরাট অর্থপূর্ণ। প্রথমত, এরূপ নামায পালনকারীর নামায কায়েম হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, কলব পরিষ্কার হয়- ফলে সে আধ্যাত্মিকভাবেও বিশেষ উপকৃত হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا

-হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু সেরে নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করে এবং সেখানে পৌঁছে দেখে জামাআত শেষ হয়ে গেছে, তবুও সে জামাআতে নামায পড়ার সওয়াব পাবে এবং যারা জামাআতে নামায পড়ে সওয়াব অর্জন করেছেন তার মধ্যে এই সওয়াবের কারণে কোন কমতি হবে না।" (সুনানে আবু দাউদ)

এ হাদীস দ্বারা এটাই বুঝানো হচ্ছে যে, জামাআতে যাওয়ার অভ্যাস ছাড়তে নেই। কোন সময় কোনো কারণবশত দেরী হয়ে গেলেও মসজিদে যেয়ে জামাআতে শরীক হওয়ার চেষ্টা চালাতে হবে। অপরদিকে এই হাদীস দ্বারা এটা বুঝাচ্ছে না যে, বিনা ওজরে জামাআত ছেড়ে মসজিদে যেয়ে একা একা নামায আদায় করলেও সওয়াব হাসিল হবে। বরং ওজরহেতু ছুটে গেলে জামাআতে শরীক হওয়ার চেষ্টার কারণে এই সওয়াব মিলবে- অন্যথায় নয়।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى

-হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আযান শোনে কোন ওজর ব্যতীত জামাআতে শরীক হয় না, তার নামায কবুল হবে না।" সাহাবায়ে

কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম আরয করলেন, ওজর বলতে কি বুঝায়? তিনি জবাব দিলেন, "অসুস্থতা ও ভয়-ভীতি।" (সুনানে আবু দাউদ)

এই হাদীসে 'কবুল না হওয়া' অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে অতিরিক্ত পুরষ্কার পাওয়া যাবে না।

سَهْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْجَفَاءُ كُلُّ الْجَفَاءِ وَالْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ مَنْ سَمِعَ مُنَادِيَ اللهِ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ يَدْعُو إِلَى الْفَلَاحِ وَلَا يُجِيبُهُ

-হযরত সাহল রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "ঐ ব্যক্তির কাজ হলো জুলুম, কুফর এবং মুনাফিকী যে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাক শোনেও মসজিদে হাজির হয় না।" (তাবারানী)

উক্ত হাদীস শরীফে মসজিদে আযান শোনার পরও সেখানে হাজির হয়ে জামাআতে শরীক হওয়ার বিরাট গুরুত্ব ব্যক্ত করতে যেয়ে, গাফিলতিকে জুলুম, কুফর ও মুনাফিকীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي فَيَجْمَعُوا حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ آتِيَ قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأُحَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ

-হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাস বলেছেন, "আমার ইচ্ছা হয় কিছুসংখ্যক যুবককে জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করে আনতে বলি এবং ওসব লোকের কাছে যাই যারা বিনা ওজরে ঘরে নামায পড়ে নেয়, সেখানে যেয়ে তাদের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে ফেলি!" (সুনানে আবু দাউদ)

এই হাদীস শরীফেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে যেয়ে জামাআতে নামায আদায়ের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। জামাআত তরককারীর প্রতি তাঁর চরম অসন্তুষ্টির কথা এখানে ব্যক্ত করে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
হানাফী মাজহাব মুতাবিক কুরআন-হাদীস শরীফ থেকে নামায

ইতোমধ্যে গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে আমার বার বার উল্লেখ করেছি যে, প্রতিটি মাজহাব বা শরয়ী পদ্ধতি তথা ফিকহ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে যে কোন একটি পদ্ধতি তথা মাজহাব অনুসরণ করলেই দ্বীন ইসলাম সঠিকভাবে পালিত হবে। আমরা এখন হানাফী মাজহাবপন্থীদের সুবিধার্তে নিম্নে নামায ও তৎসম্পর্কিত বিভিন্ন আমল-ইবাদতের পদ্ধতি পবিত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে তুলে ধরছি। এ থেকে আমার আশা করছি, প্রত্যেকের মনে এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস জন্মাবে যে, নিজের মাজহাব মুতাবিক আমলই সঠিক দ্বীন পালন, এতে কোন সন্দেহ নাই। এছাড়া লা-মাজহাবীদের মাজহাব-বিরোধী বক্তব্য যে মূলত ভিত্তিহীন, পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্ত তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে।

ওযু, গোসল ও তাইয়াম্মুম

পবিত্র কুআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

-"হে ঈমানদারগ! যখন তোমরা নামাযের জন্যে উঠ, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, মাথা মাসেহ এবং পদযুগল গিটসহ ধৌত

করো। যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও (গোসল করো) এবং যদি তোমরা রুগ্ন হও, অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, অতঃপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও- অর্থাৎ, স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেল। আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করতে চান- যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (৫:৬)

উক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ওযুর চার ফরয, গোসলের ফরয এবং তাইয়াম্মুমের ফরয ও কোন্ সময় তা করা যাবে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

عن أبي رافع قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم « توضأ ، فغسل وجهه ثلاثا ، وغسل يديه ثلاثا ، ومسح برأسه وأذنيه ، وغسل رجليه ثلاثا

-হযরত আবু রাফি' রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অযু করতে দেখেছি, তিনি চেহারা মুবারক তিনবার ধৌত করেছেন, উভয় হাতও তিনবার ধৌত করেছেন এবং একবার মাথা ও কান মুবারক মাসেহ করেছেন এবং উভয় পা মুবারকও তিনবার ধৌত করেছেন। (তাবারানী)

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ، وقال : « هذا وظيفة الوضوء الذي لا تحل الصلاة إلا به » ثم توضأ مرتين مرتين ، وقال : « هذا وضوء من أراد أن يضاعف له الأجر مرتين » ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ، وقال : « هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي »

-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একবার করে অযু করেছেন। তিনি বলেছেন, "এই অযু ছাড়া নামায ঠিক হবে না।" এরপর

তিনি প্রতিটি অঙ্গ দু'বার করে ধৌত করলেন এবং বললেন, "এরূপ অযুর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা দ্বিগুণ সওয়াব দেবেন।" এরপর তিনবার করে প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করে অযু করলেন এবং বললেন, "এটা আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের অযু"। (মুসনাদে তাইয়ালাসী)

একদা হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু একদল লোককে জিজ্ঞেস করলেন:

أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

-"আমি কি আপনাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে ওযু করতেন তা দেখাবো না? এরপর তিনি ওযু করতে লাগলেন এবং প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করলেন।" [মুসলিম শরীফ]

তাইয়াম্মুম সম্পর্কে নিয়ম নিম্নের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

عن ابن عمر انه كان يقول التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين إلى المرفقين

-হযরত ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা নিশ্চিত বলেছেন, "তাইয়াম্মুম হচ্ছে দুইবার মাটিতে হাত মারা, প্রথমবার মুখমণ্ডল মাসেহ করার জন্য এবং দ্বিতীয়বার উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করার জন্য।"

চামড়ার মুজার উপর মাসাহ

আজকাল কিছু লোক সাধারণ [কাপড়, নাইলন, পশম, সুঁতা ইত্যাদি দ্বারা তৈরী] মুজার উপর মাসাহ করে থাকেন। অথচ এটা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। একমাত্র চামড়ার তৈরী মুজার উপর মাসাহ করা জায়িয। অন্য কোন ধরনের মুজার উপর মাসাহ করা জায়িয হওয়ার প্রমাণস্বরূপ কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায় নি। আহলে হাদীস স্কলার মুবারকপুরী তাঁর তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ তুহফাতুল আহওয়াযী-এ উল্লেখ করেছেন, পশম, সুঁতা, নাইলন

ইত্যাদি দ্বারা তৈরী মুজার উপর মাসাহ করার অনুমতি কোন হাদীস থেকে পাওয়া যায় নি [১ ; পৃঃ ৩৩৩]।

মুক্বাল্লিদ যারা তারা তো এ ব্যাপারে একমত যে, চামড়ার মুজা ছাড়া অন্য কোন ধরনের মুজার উপর মাসাহ নিষিদ্ধ। এমনকি উপরে উদ্ধৃত গ্বাইর মুকাল্লিদ মুবারকপুরী ছাড়াও আরো একাধিক উচ্চপর্যায়ের গ্বাইর মুকাল্লিদ আলিমরা তা নিষিদ্ধ বলেছেন। [দেখুন, ফাতওয়াহ নাযীরিয়্যাহ; ১; ৪২৩]

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সঠিক সময়

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا أُخْبِرُكَ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَالْعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلِّ الصُّبْحَ بِغَبَشٍ يَعْنِي الْغَلَسَ

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: “যখন তোমার [সূর্যালোক থেকে সৃষ্ট] ছায়ার দৈর্ঘ্য তোমার উচ্চতার সমান হবে তখন যুহরের নামাযের ওয়াক্ত হবে। যখন তোমার ছায়ার দৈর্ঘ্য তোমার উচ্চতার দ্বিগুণ হবে তখন আছরের নামাযের সময় হবে। মাগ্বরিবের ওয়াক্ত হবে সূর্যাস্তের পরই। ’ইশার নামায পড়বে যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ চলে যায়। আর ফযরের নামায সূর্যোদয়ের পূর্বে অন্ধকার থাকাকালে আদায় করবে।” [মুয়াত্তা ইমাম মালিক (রাহ:)]

যুহরের নামাযের উত্তম সময়

إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَارُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন (মধ্যাহ্নের পরে) বেশি গরম হয়, তখন [যুহরের নামায] কিছুটা দেরী করো যাতে [আবহাওয়া] সমান্য ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কারণ, অবশ্যই গরমের প্রাবল্য হচ্ছে জাহান্নামের প্রভাব।” [মুসলিম]

উক্ত সহীহ হাদীসের অনুসরণে হানাফী মাজহাব অনুযায়ী যুহরের নামায একটু দেরীতে পালন করার নিয়ম হয়েছে। পাঠকরা নিশ্চয়ই লক্ষ করে থাকবেন, হারামাইন শরীফাইন [মক্কা ও মদীনা শরীফের পবিত্র মাসজিদদ্বয়] এবং অন্যান্য কিছু মাসজিদে যুহরের নামায সময় শুরুর সাথে সাথে পড়া হয়।

আছরের উত্তম সময়

এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অভ্যেস ছিল, আছরের নামায আদায় করতে যেয়ে এতটুকু পর্যন্ত দেরী করতেন যত সময় পর্যন্ত সূর্যের রং সাদা ও পরিষ্কার থাকতো। অর্থাৎ, লালিমা শুরুর কিছুক্ষণ পূর্বে নামায আদায় করতেন। যেমন হাদীস শরীফে আছে:

قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتْ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً

-"আল্লাহর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা যখন মদীনা শরীফে এসে সাক্ষাৎ করলাম, তখন দেখলাম আসরের নামায তিনি দেরী করে পড়তেন যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যের মধ্যে লালিমা না আসে।" [আবু দাউদ ৩৪৫, মাকবাতুশ শামিলা]

উপর্যুক্ত তথ্য থেকে বুঝা গেল আছরের ওয়াক্তও শুরু হওয়ার বেশ কিছু পরে নামায আদায় করা সুন্নাত।

ফযরের উত্তম সময়

একটি বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ

-"ফযরের নামায পূর্বাকাশ ভোরে উজ্জ্বল হয়ে ওঠার পরই [অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বে] আদায় করবে, কারণ এটা হলো অতিরিক্ত সওয়াব অর্জনের উপায়।" [তিরমিযী, ১, ১৪৬]

ইমাম তিরমিযী (রাহ:) বলেছেন, কয়েকজন সাহাবা রাদ্বিআল্লাহু আনহুম ঠিক এসময়ই নামায আদায় করতেন।

ইক্বামতের সঠিক পদ্ধতি

أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوذن لاهل مكة ،أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوذن لاهل مكة ، ومسح على ناصيته ، وقال : قل : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إلٰه إلا الله [أشهد أن لا إلٰه إلا الله] مرتين ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، مرتين - حي على الصلاة حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح مرتين ، الله أكبر الله أكبر ، لا إلٰه إلا الله ، وإذا أذنت بالاولى من الصبح فقل : الصلاة خير من النوم [مرتين] وإذا أقمت فقلها مرتين : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

-আবু মাহজুরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মক্কাবাসীদের জন্য আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তখন তিনি কাপল মুবারক মুছলেন এবং আমাকে বললেন, “বলো! আল্লাহু আকরাব! আল্লাহু আকবার!, আশহাদুআল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ (দু’বার বলো), আশহাদুআন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (দু’বার বলো), হাইয়্যাসাল সালাহ (দু’বার বলো), হাইয়্যাআলাল ফালাহ (দু’বার বলো), আল্লাহু আকরাব! আল্লাহু আকবার! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। যখন ফযরের আযান দেবে তখন (অতিরিক্ত) আসসালাতু খাইরুম মিনান্নাওম (দু’বার বলবে)। যখন ইক্বামত দিবে তখন পুরো আযানের বাক্যগুলো বলবে এবং ক্বাদক্বা মাতিস-সালাহ দু’বার বলবে।”

উপরোক্ত বর্ণনা সহীহ বলে স্বীকৃত হয়েছে। [মুছান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক; দেখুন, আ-তা-রুস সুনান; ১; পৃ: ৫৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্য আরো দু'জন মুয়াজ্জিন ছিলেন। এরা হলেন হযরত আবু মাহযূরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও ছাউবা-ন রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তাঁরাও উপরোক্ত নিয়মে আযান ও ইক্বামাতের শব্দগুলো দু'বার করে উচ্চারণ করতেন। আল্লামা শওকা-নী (রাহ:) এই বর্ণনাটি সঠিক বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। [নাইলুল আওতা-র, ২; পৃ: ২৪]

নামাযের সময় মাথা ঢাকা (টুপি পরা)

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس قلنسوة بيضاء

-আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সাদা টুপি পরতেন।" এই হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ বলে ঘোষাণা দিয়েছেন, আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রাহঃ)। [শুয়াবুল ঈমান; সিরাজুল মুনীর; ৪; পৃ: ১১২]

ফাতওয়াহ তুনাইয়্যাহ [১: পৃ: ৫২৫] এবং আহলে হাদীসদের ফাতওয়ায়ও [৪; পৃ: ২৯১] লিখা আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদাই তাঁর মাথা মুবারকে নামাযের সময় টুপি রাখতেন। উক্ত কিতাবদ্বয়ে এটাও উল্লেখিত আছে, ইচ্ছে করে খালি মাথায় নামায পড়া সুন্নাতের খেলাফ। [১; পৃ: ৫২৩]

দুঃখের বিষয় আজকাল মসজিদে অনেক মুসল্লি [বিশেষকরে নতুন প্রজন্মের কিছু ছেলেদেরকে] দেখতে পাওয়া যায়, খালি মাথায় নামায আদায় করছেন। শুধু তাই নয়, অনৈসলামিক পরিধেয় পরে এবং সেসাথে টুপি ছাড়া নামায পড়া যেনো একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে! অথচ এটা যে সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ, তা কেউ বুঝতে মোটেই রাজী নয়।

কানের লতি পর্যন্ত দু'হাত উত্তোলন

عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّهُ رَأَى نَبِيَّ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– وَقَالَ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

-হযরত ক্বাতাদা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মালিক ইবনে হুয়াইরিস রাদ্বিআল্লাহু এটাও দেখেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাস [তাকবীরে তাহরিমার সময়] কানের লতি পর্যন্ত উভয় হাত উঠিয়েছেন”। [সহীহ মুসলিম]

হাতদ্বয় নাভির নীচে বাঁধা

عن علی رضی الله عنه قال ان من السنة في الصلوة وضع الكف على الكف تحت السرة

-হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, “এক হাতের তালু অপর হাতের উপর রেখে নাভির নীচে বাঁধা হলো সুন্নাত পদ্ধতি” [সুনান আল-বাইহাকী, ৩১২, মুছান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ, ১; ৩৯১; আবু দাউদ ১, ৭৫৫]।

একই ধরনের হাদীস আবু হুরাইরাহ, হযরত আনাস, হযরত ওয়াঈল ইবনে হুজর, হযরত হাজ্জাজ ইবনে হাসান, হযরত ইব্রাহিম না'খি রাদ্বিআল্লাহু আনহুম প্রমুখ বর্ণনাকারীদের থেকে এসেছে।

আমরা জানি অনেকে হাতদ্বয় বুকের উপর কিংবা একটু নীচে বাঁধেন। যদিও হযরত ওয়াঈল ইবনে হুজর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত দু'টি দুর্বল হাদীস ও হযরত হুলব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত অপর আরেকটি ও অন্যান্য হাদীসে বুকের উপর বা একটু নীচে বাঁধার উল্লেখ আছে, কিন্তু নাভির নীচে বাঁধার ক্ষেত্রে হানাফীরা মতামত দিয়েছেন কয়েকটি বিশেষ কারণে।

প্রথমত ওয়াঈল ইবনে হুজর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত প্রথম হাদীসটি সহীহ ইবনে খুজাইমায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেখানে তিনি বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে নামায আদায় করেছি। তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুক মুবারকের উপর রাখেন।” একই হাদীস মুসনাদ আল-বাযযাজে বর্ণিত হয়েছে, সেখানে ‘বুকের উপরের’ বদলে বলা হয়েছে, “বুকের নিকটে”। এছাড়া মুছান্নাফ ইবনে আবি শাইবা নামক হাদীস গ্রন্থে একই বর্ণনায় এসেছে, “নাভীর নীচে” যা

ইতোমধ্যে আমরা উল্লেখ করেছি। তবে কয়েকটি কারণে এই বর্ণনা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ক. প্রথম বর্ণনার একজন বর্ণনাকারীর নাম মু'আম্মাল ইবনে ইমসা'ঈল। তিনি একজন দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছেন। ইমাম বুখারী বলেন, "তার বর্ণনা অগ্রাহ্য হয়েছে" [মুনকার আল-হাদীস]। আল্লামা জাহাবী বলেন, "তিনি অনেক ভুল করেন" [কাছির আল-খাতা]। আবু জুরা' বলেন, "তার বর্ণনাসকলের মধ্যে অনেক ভুল আছে" [ফাতহুল মুলহিম, ২:৪০]।

খ. একই বর্ণনা আরোও একাধিক হাদীস গ্রন্থে আছে। যেমন আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ইত্যাদি। কিন্তু এসব কিতাবে 'বুকের উপর' লিখা নেই।

গ. অনেকে বলেন, ইবনে খুজাইমাহ সহীহ। কিন্তু তা সঠিক নয়। আল্লামা সুয়ূতী তাঁর তাদরিব আর-রাউয়ি কিতাবে বলেন, সহীহ ইবনে খুজাইমাতে কিছু কিছু দুর্বল ও মুনকার [অগ্রহণীয়] বর্ণনা আছে। এছাড়া ইমাম তিরমিযীর মতো ইবনে খুজাইমা তাঁর হাদীস সংকলনে বর্ণিত হাদীসের শক্তি ও সহীহ হওয়া না হওয়ার উপর আলোচনা করেছেন। কিন্তু এ হাদীসটির ব্যাপারে তিনি কোন মতামত পেশ করেন নি।

অন্য বর্ণনাকারী দ্বারা এ সম্পর্কে আরো দু'টি হাদীস খুঁজে পাওয়া যায়। এ দু'টোও যে দুর্বল তা আমরা এখন আলোচনা করবো।

প্রথম হাদীসটি এই: হুলব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান ও বাম দিকে থেকে ফিরে তা (হাতদ্বয়) তাঁর বুক মুবারকের উপর রাখতেন। [মুসনাদে আহমাদ]

আল্লামা নিমাওয়ী উপযুক্ত প্রমাণপঞ্জীসহ দেখিয়েছেন যে, উপরোক্ত হাদীসের শব্দব্যবহারে একটি ভুল আছে। 'আলা হাদিহি' [অন্য হাতের উপর] লেখার বদলে, ভুলে 'আলা সাদরিহি' [তাঁর বুকের উপর] লিখা হয়েছে। সুতরাং প্রমাণ হিসেবে এই বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। [আতহার আস-সুনান, ৮৭]

দ্বিতীয়টি হলো: আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু পবিত্র কুরআন শরীফের আয়াত: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

-"অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন।" [১০৮:২] এর ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বলেন, [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর মাঝখানে রেখে তা বুকের উপর স্থির করেন, যাতে উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর হিসেবে তা বুঝানো যায়।" [সুনানে বাইহাক্বী, ২:৩০]

আল্লামা ইবনে তুরকুমানী আল-মারদিনী তাঁর জাওয়াহার আন-নাক্বী গ্রন্থে প্রমাণসহ প্রতিষ্ঠা করেছেন, ইসনাদ [বর্ণনার চেইন] ও মাতন [লেখা] উভয়টি এ বর্ণনায় অপরিষ্কার। ইমাম বাইহাক্বী ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে একই ধরনের এক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন যেখানে, রাউহ ইবনে মুসাইয়্যিব নামক এক বর্ণনাকারী আছেন। তার সম্পর্কে ইবনে হিব্বান লিখেছেন: "তিনি মিথ্যা বর্ণনা করেন। তার কাছ থেকে বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।"

এছাড়া বর্ণিত আয়াতের তাফসীর আসলে অন্যটি। আল্লামা সা'তি লিখেন: "এই তাফসীর হযরত আলী কিংবা ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার হতে পারে না। ইবনে কাছীর এর তাফসীরে বলেছেন, আয়াতটি কুরবানী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।"

হানাফী মতের আরো কিছু সাধারণ কারণ আছে। প্রখ্যাত হানাফী লেখক ইবনে হুমান বলেছেন: বিভিন্ন বর্ণনায় -বিরোধিতা, ভুল-ত্রুটি ইত্যাদি থাকায় এ ব্যাপারে এন্যালজী ও গবেষণার উপরই নির্ভর করা ভালো। মহান রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়ানোতে অবশ্যই বিনয় ভাব প্রকাশ হওয়া চাই। যেহেতু নাভির নীচে হাত রাখা হয়তো সর্বাপেক্ষা বিনীতভাবে দাঁড়ানোর ভাব ফুটে ওঠে তাই এটাই হবে অন্যভাবে দাঁড়ানো অপেক্ষা উত্তম। এছাড়া, মহিলাদেরকে বুকের উপর হাত রাখার নির্দেশের পেছনেও কারণ আছে। আর তাহলো, এতে গোপনীয়তা এবং ভদ্রতা বজায় থাকে। [ফাতহুল ক্বাদীর]

আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী মন্তব্য করেছেন: বুকের উপর হাত রাখা মহিলাদের মতো সমান হয়ে যায়, সুতরাং এটা পুরুষদের জন্য সুন্নাহ হিসেবে নির্দিষ্টকরণ সঠিক হবে না। ['উমদাতুল ক্বারী, ৩:১৬]

ছানা পাঠ

হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ... ..' এই ছানাটি নামাযের তাক্ববীরে তাহরীমা পরে পাঠ করতেন। [সহীহ মুসলিম, ১:৭৮৮]

'বিছমিল্লাহ ... ..' নীরবে বলা

আজকাল দেখা যায় অনেক ইমাম [যাদের কেউ হানাফী নন] ইমামতির সময় 'বিসমিল্লাহ ....' সজোরে পাঠ করেন। এভাবে পড়া হানাফী মতে সঠিক নয়। এর প্রমাণস্বরূপ আমরা হাদীস শরীফ থেকে বর্ণনা তুলে ধরছি।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِ { الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا

-হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, 'আমি জামাআতের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু, উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর পেছনে নামায আদায় করেছি। আমি তাঁদের কারো মুখে ক্বিরাআতের আগে বা পরে 'বিছমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম' [সজোরো] পাঠ করতে শুনি নি।' [সহীহ মুসলিম, ১:৭৮৮]

ইমাম তিরমিযী লিখেছেন, অধিকাংশ সাহাবা রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বিছমিল্লাহ শরীফ আস্তে আস্তে পাঠ করতেন। মুক্তাদীদের পক্ষে শুধু নীরবে শ্রবণ করে যাওয়াই সুন্নাত।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"এবং, যখন কুরআন পঠিত হয় তখন নীরবে মনোযোগসহ শ্রবণ করো, যাতে রহমত তোমাদের উপর পতিত হয়।" [সূরা 'আরাফ : ২০৪]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মুগ্বাফফাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, কুরআন শরীফের

উপরোক্ত আয়াত জুমুআর খুতবা ও নামায সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। [তাফসিরে ইবনে কাছীর]

সুতরাং কুরআন শরীফের নির্দেশানুযায়ী যখন কোন ইমাম সজোরে নামাযে বা খুতবায় কুরআন তিলাওয়াত করবেন তখন মুক্তাদীদের জন্য তা নীরবে শ্রবণ করতে হবে। সুতরাং সূরা ফাতিহা শেষে 'আমীন' বলা যদিও সুন্নাত কিন্তু তা বলতে হবে নীরবে [উভয়- ইমাম ও মুক্তাদী]।

আমীন নীরবে না বলার পেছনে যেসব বর্ণনা আছে তার কিছুটা আমরা আলোচনা করবো। তবে আগেই বলে রাখি হানাফী মতে আমীন বলা সুন্নাত ও তা আস্তে আস্তে বলতে হবে।

প্রথমে আমরা কয়েকটি হাদীস শরীফ এখানে উদ্ধৃত করছি। এরপর এগুলোর উপর কিছুটা আলোচনা করে আশারাখি এটা প্রতিষ্ঠা করবো যে, ইমামের পেছনে জামাআতে নামায আদায়ের সময় হানাফী মতে কেন সজোরে আ-মীন বলা সুন্নাতের খেলাপ হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে।

১.

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذْ قَالَ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } فَقُولُوا آمِينَ

-আবু সাঈদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খুতবায় কিভাবে আমাদেরকে সঠিক (সুন্নাহ) পদ্ধতিতে নামায আদায় করবো তা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, "যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে তখন লাইন সোজা করবে; এরপর যে কোন একজন অন্যদেরকে নামাযে নেতৃত্ব দেবে, [অর্থাৎ একজন ইমামতি করবে]। যখন তিনি [ইমাম] তাকবীর দেবেন তখন তোমরাও তাকবীর দেবে; এবং যখন তিনি 'গ্বাইরিল মাগ্বদুবি'আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়া-ল্লীন' বলবেন তখন তোমরা আ-মিন' বলো" [সহীহ মুসলিম, ১:১৭৪]।

২.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

-আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ইমামকে অনুসরণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যখন তিনি তাকবীর উচ্চারণ করবেন তখন তোমরাও তা উচ্চারণ করো; যখন তিনি তিলাওয়াত করেন তখন নীরব থেকো; এবং যখন তিনি বলেন, 'সমীআল্লা-হুলিমান হামীদাহ' তোমরা বলো 'রাব্বানা- লাকাল হামদ' [সুনানে আবু দাউদ, ১:৯৬; সুনানে নাসাঈ, ৪৬]।

উপরোক্ত দু'টি হাদীস শরীফ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

-"সুতরাং, যখন কুরআন পঠিত হয় তখন নীরবে মনোযোগসহ শ্রবণ করো যাতে রহমত তোমাদের উপর পতিত হয়" [সূরা 'আরাফ : ২০৪] এর সঠিক ব্যাখ্যা হয়েছে। জামাআতে নামায আদায়ের সময় ইমাম ও মুক্তাদীর কর্তব্য কী তা উক্ত হাদীসগুলো পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

প্রথমত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্তাদীকে ইমাম কর্তৃক ফাতিহা পাঠের [অর্থাৎ, নীরবে বা সরবে তিলওয়াতের সময়] নীরব থাকার কথা বলেছেন। এতে প্রমাণ হলো জামাআতে নামাযে মুক্তাদীদের জন্য ফাতিহা পাঠ করতে নেই।

দ্বিতীয়ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্তাদীকে বলছেন, ইমাম যখন ফাতিহা পাঠ করে শেষ করবেন তখন 'আ-মিন' বলো।' আ-মিন' এর অর্থ হচ্ছে, হে আল্লাহ! কবুল করো।

সুতরাং আমরা হানাফী মাজহাব অনুযায়ী মুক্তাদীর জন্য ফাতিহা পাঠ যে সঠিক নয় তার প্রমাণ করলাম। অবশ্য উপরোক্ত হাদীসদ্বয় ছাড়াও আরো অনেক হাদীস ও গ্রহণযোগ্য বর্ণনায় মুক্তাদীকে ইমামের পেছনে নীরব থাকার কথা উল্লেখিত হয়েছে। এখানে আর বেশি উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তবে একটা কথা সবাইকে মনে রাখতে হবে যে, একা একা কেউ

যদি নামায আদায় করেন তাহলে অবশ্যই তাকে প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে।

আমরা উপরোক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা এটাও প্রমাণ করলাম যে, ইমাম কর্তৃক ফাতিহা পাঠের পর 'আ-মিন' বলা সুন্নাত- কিন্তু তা কি সরবে বলতে হবে? এবার এ প্রশ্নের জবাব বের করা দরকার। কারণ, হানাফী মতে নীরবে 'আ-মিন' বলা সুন্নাত, সরবে নয়।

আ-মিন নীরবে বলার কারণ

আ-মিন বললে যে কত লাভ হয় তার প্রমাণস্বরূপ একটি হাদীস শরীফ এখানে উদ্ধৃত করছি।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন ইমাম বলবেন, 'গ্বাইরিল মাগ্বদুবি'আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়া-ল্লিন' তখন [মুক্তাদীরা] 'আ-মিন' বলো, কারণ ফেরেশতারা [এসময়] আ-মিন বলেন। আর যার 'আ-মিন' বলা ফেরেশতাদের বলার সঙ্গে মিশে যাবে, তার অতীতের সব গোনাহ মাফ হয়ে যাবে" [বুখারী, ১:১০৮]।

সুতরাং 'আ-মিন' বলার ক্ষেত্রে কোন মতানৈক্য নেই- এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে ঐ সময় 'আ-মিন' বলা একটি উত্তম সুন্নাত। তবে সরবে না নীরবে তা বলা হবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে বৈকি।

এটা বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় নীরব ও সরবে 'আ-মিন' উচ্চারণ করেছেন। এতে এটাই প্রমাণ হলো যে, কেউ যদি সরবে বলে এবং অপর কেউ নীরবে বলে তাতে কোন অসুবিধা নেই- উভয়ের বলাই হবে সুন্নাত। তবে যখন সরবে বলনেওয়ালা নীরবে উচ্চারণ করনেওলাকে 'অজ্ঞ' বা এরূপ কোন মন্তব্য দ্বারা হেয় করেন তখনই সমস্যা দাঁড়ায়। অবশ্য একইভাবে

নীরবে বলনেওয়ালাও সরবে উচ্চারণকারীকে কটুক্তি করতে পারেন। আমরা আশা করবো যারা মাজহাব অনুসরণ করেন তারা যারতার মাজহাব অনুযায়ী সরবে কিংবা নীরবে 'আ-মিন' পাঠ করবেন ও কেউ প্রশ্ন করলে উত্তর দেবেন, 'আমার মাজহাব অনুযায়ী আমি আমল করেছি'। এরপরও কিছু বললে, জবাব দেবেন মাজহাব মানা না মানা আমার ব্যাপার। ব্যাপারটি নিয়ে যে বাড়াবাড়ির কোন প্রয়োজন নাই তা আমরা ইবনে কাইয়্যিম (রাহ:) থেকে জেনে নিতে পারি। তিনি লিখেছেন:

"এই ব্যাপারটি ঐসব গ্রহণযোগ্য মতানৈক্যের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত যেগুলোর অনুসরণকারীকে [অর্থাৎ সরব কিংবা নীরবে বলনেওয়ালাকে] কোনভাবেই সমালোচনার সুযোগ নেই। এটা রুকুর পরে দাঁড়িয়ে হাত তুলা বা না তুলার সমপর্যায়ের ব্যাপার [অর্থাৎ তা-ও উভয় ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য - কোন না কোন ইমামের সমর্থিত পন্থা।]" [জাদুল-মা'আদ, ১:৭০]।

আ-মিন নীরবে বলার ক্ষেত্রে হানাফীদের সিদ্ধান্তের কারণ

যা হোক হানাফীরা কেন 'আ-মিন' নীরবে পাঠের পক্ষপাতী তা এখন ব্যাখ্যা করা হবে।

সকল ইমামের মতামত হলো যেসব নামাযে ইমাম সূরা-কিরাআত নীরবে পাঠ করেন [অর্থাৎ যুহর, ও আছর] সে ক্ষেত্রে ইমাম ও মুক্তাদীরা নীরবে 'আ-মিন' বলবেন। এখানে কোন দ্বিমত নেই। তবে ফযর, মাগ্বরিব, ইশা ও জুমু'আর নামাযে ইমামকে সূরা-কিরাআত সরবে পাঠ করতে হয়। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিকের মতে এসব নামাযেও ইমাম এবং মুক্তাদীকে 'আ-মিন' নীরবে পাঠ করতে হবে।

হানাফীরা বলেন, যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সজোরে 'আ-মিন' বলেছেন বলে প্রমাণ মেলে তথাপি এর কারণ ছিল 'আ-মিন' বলার গুরুত্ব সাহাবীদেরকে বুঝানো। কারণ, পরবর্তীতে তিনি 'আ-মিন' নীরবে বলেছেন। হানাফীরা এই মতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার কয়েকটি কারণ আছে।

প্রথমত পবিত্র কুরআন-হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, 'আ-মিন' বলা একটি দু'আ। হাফিজ ইবনে হাজর আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

বলেন: "যে আ-মিন বলে তাকে একজন দু'আ পাঠকারী হিসেবে ধরে নেওয়া হয়- কারণ আল্লাহ বলেছেন, "তোমাদের দু'আ কবুল হয়েছে (হে মূসা ও হারুন!)।" [সূরা ইউনুস-৮৯] যখন মুসা আলাইহিস-সালাম দু'আ করছিলেন আর হারুন আলাইহিস-সালাম আ-মিন বলছিলেন। এ ব্যাপারে একটি হাদীসও হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে।" [ফাতহুল বারী]

দু'আ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নীরবে পাঠের জন্য স্বয়ং আল্লাহ পাকই নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর পবিত্র কালামে। ইরশাদ হয়েছে,

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

-"তোমার প্রতিপালকের স্মরণ করো বিনয় ও একান্ত সংগোপনে। তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।" [৭ঃ৫৫] অন্য আয়াতে আছে,

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا

-"যখন সে (জাকারিয়া) তাঁর প্রতিপালককে ডাক দিল গোপনে।" [১৯ঃ৩]

সুতরাং 'আ-মিন' বলা যেহেতু দু'আর অন্তর্ভূক্ত তাই তা নীরবে বলাই হলো সর্বাপেক্ষা উত্তম। কারণ দু'আ সজোরে বলার মধ্যে সামান্যতম হলেও রিয়ার প্রকাশ পেতে পারে যা কারো কাম্য নয়। এ কারণেই অধিকাংশ দু'আ নীরবে পাঠ করাই ভালো। এছাড়া দু'আ নীরবে পড়ার জন্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাগিদ দিয়েছেন বলে বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়। এবার আমরা এরূপ ক'টি হাদীস শরীফের উপর আলোচনা করবো।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন ইমাম 'গ্বাইরিল মাগ্বদ্বুবি'আলাইহিম ওয়ালাদ্বদ্বোয়া-ল্লিন' বলেন তখন বলো 'আ-মিন'। কারণ, ফিরশতারা এবং ইমামও তা বলেন।" [নাসাঈ, ১১৪৭]

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে ইমাম 'আ-মিন' নীরবে বলবেন। কারণ, ইমাম যদি সরবে বলতেন তাহলে 'ইমামও তা বলেন' এ কথাটি হাদীসে উল্লেখের প্রয়োজন থাকতো না। মুক্তাদীরা এমনিতেই তো ইমামের

'আ-মিন' বলা শ্রবণ করতেন। তাই সে ক্ষেত্রে হাদীসে হয়তো এভাবে উল্লেখ থাকতো: 'ইমাম যখন আ-মিন বলেন তোমরাও বলো', কিন্তু হাদীসের ভাষ্য ভিন্ন- অর্থাৎ জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ওয়ালা-দ্বদ্বোয়া-ল্লিন বলে সূরা ফাতিহা শেষ করে ইমাম নীরবে 'আ-মিন' বলে থাকেন এবং ফিরিশতারাও তখন তা বলেন, সুতরাং তোমরাও বলো। বলা হয়নি, তোমরাও তা সরবে বলো।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীস থেকেও সমর্থনযোগ্য। হাদীসটি এই: "যখন ইমাম ওয়ালাদ্বদ্বোয়া-ল্লিন বলেন তখন (মুক্তাদীরা) আ-মিন বলো।" [বুখারী, ১:১০৮]

এখানেও লক্ষণীয় যে, ইমামের দ্বারা সরবে সূরা ফাতিহার শেষ আয়াতের কথা বলা হয়েছে [যেহেতু তা সবাই শ্রবণ করবে]। বলা হয়নি, ইমাম যখন বলবেন, 'আ-মিন'। এতে বুঝা গেল ইমামও আ-মিন নীরবে বলবেন।

আ-মিন নীরবে বলার প্রমাণ সাহাবায়ে কিরাম থেকেও একাধিক বর্ণনায় মিলে। যেমন, ১.

عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ لا يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ æالرَّحِيمِ، وَلا بِالتَّعَوُّذِ، وَلا بِآمِينَ æ

-আবু ওয়াইল রাহামতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত: "আলী ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ অথবা আ-মিন সরবে পাঠ করতেন না।" [মাযমা'আল যাওয়াঈদ ২:১০৮, তাবারানী]

২. আবু ওয়াইল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে আছে: "হযরত উমর ও হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বিসমিল্লাহ, আউযুবিল্লাহ এবং আ-মিন সরবে বলতেন না।" [ই'লাউস সুনান]

৩. ইমাম আব্দুর রাজ্জাক [এবং ইমাম মুহাম্মাদ তাঁর কিতাবুল আতহার-এ] প্রসিদ্ধ তা'বিঈ ইব্রাহিম নাখাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি উক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন:

خمس يخفين سبحانك اللّٰهُمَّ ! وبحمدك ، والتعوذ ، وبسم الله الرحمن الرحيم ، وآمين ، واللّٰهُمَّ ! ربنا لك الحمد.

-"ইমামকে পাঁচটি জিনিষ নীরবে বলতে হবে: সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা .. [ছানা], আউযুবিল্লাহ ... [তাওউদ], বিসমিল্লাহ ... [তাছমিয়াহ], আ-মিন এবং আল্লা-হুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ।" [মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ২:৮৭]

নামাযের ভেতর তাক্ববিরের সময় হাত কাঁধ পর্যন্ত ওঠাতে নেই

তাক্ববিরে তাহরিমার পরে অন্যান্য তাক্ববির যেমন রুকুতে যাওয়া, ওঠা ও সিজদায় যাওয়া ইত্যাদি পালনের সময় হাত কাঁধ পর্যন্ত ওঠানো হানাফী মাজহাবে নাই। এর কারণ হিসেবে আমরা কয়েকটি হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি পেশ করছি।

১.

جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ

হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, "একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হুজরা শরীফ থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে এসে বললেন, তোমাদেরকে কেন একরোখা ঘোড়াদের লেজের মতো হাত উত্তোলন করতে দেখছি? নামায শান্তভাবে পালন করো'।" [সহীহ মুসলিম, ১:৮৬৪]

২.

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে নামায পড়তেন তা কি আমি আপনাদেরকে দেখাবো না?" এরপর তিনি নামায পড়লেন এবং তাক্ববীরে তাহরিমা ছাড়া আর তাঁর হাত উত্তোলন করলেন না। [তিরমিযী, ১:২৪৪]

উপরোক্ত হাদীসটি 'হাসান' হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। ইবনে হাযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এটাকে সহীহ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এছাড়া

আহমাদ শাকীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-ও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। উল্লেখ্য প্রথম ও এই দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, প্রাথমিক যুগে নামাযের ভেতর তাকবীর দেওয়ার সময় হাত উত্তোলন করা হতো কিন্তু পরে তা রহিত হয়ে গেছে। কারণ, দ্বিতীয় হাদীসে বর্ণনাকারী [হযরত ইবনে মাসুদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায আদায়ের পদ্ধতি নিজে আ'মল করে দেখিয়েছেন।

৩. বর্ণিত আছে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রথম তাক্ববীরের (তথা তাক্ববীরে তাহরিমার) সময় হাত উত্তোলন করতেন। এরপর আর তিনি হাত তুলেন নি। [সুনানে বাইহাক্বী]

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাতা হযরত ইবনে হাজর আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত যাইলা'য়ি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত আ'ইনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উপর্যুক্ত বর্ণনাটি সহীহ বলেছেন। এছাড়া এটা জেনে নেওয়া দরকার যে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছাড়াও প্রসিদ্ধ সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই নামাযে একবার মাত্র [তাক্ববীরে তাহরিমার সময়] হাত উঠাতেন। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রমুখ। সুতরাং এভাবে নামায আদায় পদ্ধতি সাহাবায়ে কেরামেরও সুন্নাত। [ইমাম তিরমিযী]

জলসাতুল ইসতিরাহা না করা

দ্বিতীয় সিজদার পর সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য না বসা [জলসাতুল ইসতিরাহা না করা] সঠিক পদ্ধতি।

আমরা লক্ষ করে থাকি কেউ কেউ নামায পড়ার সময় দ্বিতীয় সিজদা শেষে সোজা না দাঁড়িয়ে ক্ষণকালের জন্য বসে তারপর উঠেন। এরূপ করার কোন যৌক্তিকতা নেই। কেন নেই- তার প্রমাণ এবার হাদীস শরীফ থেকে তুলে ধরছি।

১. একটি বর্ণনায় ইবনে সাহল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাক্ববীর উচ্চারণ করলেন ও একই সময় সিজদায় চলে গেলেন। তারপর আবার তাক্ববীর উচ্চারণ করলেন [দ্বিতীয় সিজদা শেষে] ও একই সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন [বসলেন না]। [আবু দাউদ, ১:৯৬১]

২. ইমাম বাইহাক্বী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সুনানে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, উপরোক্ত পদ্ধতিতে হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু নামায আদায় করতেন। এছাড়া আল্লামা জাইলা'য়ি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর নাসবুর রা-ইয়াহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ির রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহাবারাও একই পদ্ধতিতে নামায পড়তেন। তাঁরা কেউই দ্বিতীয় সিজদা শেষে ক্ষণকালের জন্য বসেন নি [খণ্ড, ১: পৃঃ ২৮৯]। আল্লামা তুরকুমা-নী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর জাওহারুন নাক্বি নামক গ্রন্থে আরও একাধিক সাহাবায়ে কেরামের নামায পদ্ধতি এভাবেই ছিলো বলে উল্লেখ করেছেন। [খণ্ড ১: পৃঃ ১২৫]

তাশাহহুদের সময় শাহাদাত অঙ্গুলি উঠানো

অনেকে তাশাহহুদ [আত্তাহিয়্যাতু] পাঠের সময় শাহাদাত অঙ্গুলি খাড়া করে নড়াচড়া বা ঘুরাতে থাকেন। এতে ব্যক্তিগতভাবে নামাযের মধ্যে একাগ্রতায় বাঁধার সম্মুখীন হয়েছি। সঠিক উপায়ে এ সুন্নাতটি পালন করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হাদীস শরীফ থেকে শিক্ষা নেওয়া যায়।

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহহুদের সময় তাঁর ডান হাত মুবারক ডান উরু মুবারকে এবং বা হাত মুবারক বাম উরু মুবারকে রাখতেন। এরপর তিনি তাশাহহুদ পাঠের সময় যখন শাহাদাত [অর্থাৎ আশাহাদুআল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ] বলতেন তখন তাঁর ডান হাতের শাহাদাত অঙ্গুলি মুবারক উঠাতেন। তিনি তাঁর মধ্যম ও বৃদ্ধাঙ্গুলি মুবারক মিলিত করে নিতেন [এতে একটি চক্র হয়ে যেত]। [সহীহ মুসলিম, ১:১২০২]

লক্ষ্য করুন, এখানে কোথাও বলা হয়নি আঙ্গুলটি তুলে নাড়াতেন কিংবা ঘুরাতেন।

নামায শেষে হাত তুলে দু'আ পড়া

নামায শেষে অনেকে হাত তুলে দু'আ পড়তে নারাজ। দেখা যায়, ইমাম সাহেব ও প্রায় সকল মুসল্লিরা হাত তুলে দু'আ করছেন কিন্তু এখানে সেখানে এক দু'জন মুসল্লি হাত না উঠিয়ে বসে আছেন। এতে সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্নের উদ্রেক হয়। কিন্তু আসলে এরূপ দু'আ করাতে কোন দোষ নেই। এটা মুস্তাহাব পর্যায়ের আমল। তবে তা নামাযের অংশ হিসাবে মনে করতে নেই।

আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে একটি বর্ণনায় জানা যায় তিনি একদা লক্ষ্য করলেন এক ব্যক্তি নামায শেষ করার পূর্বেই [সম্ভবত শেষ বৈঠকে সালাম ফেরানোর আগে], হাত উত্তোলন করে দু'আ করছেন। জুবায়ের রাদ্বিআল্লাহু আনহু নামায শেষে তার কাছে গিয়ে বললেন, "ওহে! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাত্র নামায শেষেই হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন।" [এই হাদীসটি গ্রহণযোগ্য বলা হয়েছে: মাযমাউয যাওয়া-ইদ, খণ্ড ১, পৃঃ ১৬৯]

বিতর নামায তিন রাকাআত

হানাফী মাজহাবে বিতর নামায তিন রাকাআত পড়া ওয়াজিব। নিম্নে এ ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস ও বর্ণনা তুলে ধরছি।

১.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ

-হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু তিন রাকাআত করে বিতর নামায পড়তেন। প্রথম রাকাআতে সূরা 'সাব্বি হিসমা ...', দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাআতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন [সুতরাং এভাবে পড়া মুস্তাহাব]। (সুনানে নাসাঈ)

২.

أنه كان يُصلي مَثنى مَثنى، ثم يُوتر بثلاث لا يفصِل بينهن فهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة، أنه كان يُوتِر بثلاث لا فصل فيهن وروى النسائي عنها: كان لا يُسلم في ركعتي الوتر

জাদুল মা'আদে আছে: হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু' রাকাআত করে নামায আদায় করলেন, পরে বিতর পড়লেন তিন রাকাআত, এর মধ্যে পৃথক করলেন না [সালাম ফেরালেন না]। (ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনা]; হযরত আয়শা সিদ্দীকা রাদ্বিআল্লাহ আনহা বর্ণনা করেন, তিনি (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিতর তিন রাকাআত আদায় করলেন, এর মধ্যখানে কোন সালাম ফেরালেন না। ইমাম নাসাঈ রাহমাতুল্লাহি বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর রাকাআতে দু' রাকাআত পরে সালাম ফেরান নি। [জাদুল মা'আদ, পৃঃ ১১০]

৩. হাফিজ ইবনে হাজার আকসালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ফাতহুল বা-রী কিতাবে উল্লেখ করেন: হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বিতর নামাযে তিন রাকাআত পূর্ণ করার পর সালাম ফেরাতেন, দু'রাকাআত পরে নয়। [ফাতহুল বা-রী, খণ্ড ১ : পৃঃ ২৯১]

তারাবীর নামায ২০ রাকাআত

তারাবীর নামায ২০ রাকআত হওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘ ১৪০০ বছর যাবৎ কেউ ভিন্নমত পোষণ করেন নি। কিন্তু এ নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে তা ৮, ১২ কিংবা ২০ রাকাআত হতে পারে। এরূপ বলার পেছনে যে এই নামাযের গুরুত্বকে খাঁটো করা ও নফসের খাহেশকে পূর্ণ করা [অর্থাৎ দীর্ঘ নামায আদায় করতে মন ও তন মানে না!] উদ্দেশ্য তা আর বলার উপেক্ষা রাখে না।

সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাতকেও আমরা মর্যাদাসহ পালন করে থাকি। তাঁদেরকে অনুসরণ করাও সবার কর্তব্য। তারাবীর নামায ২০ রাকাআত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। এর পূর্বে অর্থাৎ প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর সময় তারাবীর নামায জামাআতে আদায় হতোই না। হযরত উমরই সর্বপ্রথম ২০ রাকাআত নামায জামাআতে আদায়ের মাধ্যমে রমজান মাসে পুরো কুরআন শরীফ খতম করার নিয়ম শুরু করেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তকে বিনাবাক্যে সে যুগের প্রসিদ্ধ সাহাবাসহ সবাই মেনে নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সেই থেকে আজ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পবিত্র রমজান মাসে বিশ্বের সকল মুসলমান তারাবীর নামায আদায় করে আসছেন। বর্তমানে মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতেও জামাআতের সঙ্গে তারাবীর নামায ২০ রাকাআত পড়া হয়। সাহাবায়ে কেরামের যুগে কিভাবে তারাবীর নামায ২০ রাকাআত হলো এবং পালন করা হতো তার প্রমাণ স্বরূপ আমরা একটি হাদীস তুলে ধরছি।

১. হযরত ইয়াদীন ইবনে রুমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর খিলাফতকালে সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম ২০ রাকাআত তারাবীর এবং ৩ রাকাআত বিতর নামায [জামাআতের সঙ্গে] পড়েছেন। [মুআত্তা ইমাম মালিক, ২৪৬]

ঈদ ও জানাযার নামাযের তাকবীর

হযরত আবু মূসা আশআ'রী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করা হলো: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় ঈদের নামাযে ক'টি তাকবীর দিতেন? তিনি উত্তরে বললেন, "তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নামাযে [প্রতি রাকাআতে] ৪টি করে তাকবীর দিতেন, যেভাবে তিনি জানাযার নামাযেও ৪টি তাকবীর দিতেন।" হযরত হুজাইফী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় যা থেকে এর সমর্থন মিলে। [আবু দাউদ, ১:১১৪৯]

ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুসহ অন্যান্য আরো কয়েকজন সাহাবা রাদ্বিআল্লাহু আনহুম থেকে অনুরূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

মুসাফির হওয়ার ক্ষেত্রে ভ্রমণের দূরত্ব

শরীয়তের আইন মুতাবিক মুসাফির হওয়ার ক্ষেত্রে কতটুকু দূরত্বে নিজ বসতবাড়ি বা মহল্লা থেকে ভ্রমণ করতে হয় তার সঠিক হিসাব আমরা নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে পাই।

বর্ণিত আছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা ক্বসর (মুসাফিরী) নামায আদায় করতেন ও ইফতার সেরে নিতেন [অথাৎ রোজা রাখতেন না] যখনই তাঁরা ৪ বুরুদ পর্যন্ত দূরত্বে ভ্রমণ করতেন। ৪ বুরুদ হলো ১৬ ফারসাখ অর্থাৎ ৪৮ মাইল। [সহীহ বুখারী, ক্বসর নামায আদায়ের অধ্যায়]

ফাতওয়া তুনাইয়্যাতে আছে, অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন বলেছেন, ৪৮ মাইল ভ্রমণই হচ্ছে শরঈ দৃষ্টিতে সফর। অনেকে ৯ মাইল বলেন, তা সঠিক নয়।

ক্বসর নামাযের জন্য কোন স্থানে ক'দিন থাকা যাবে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, যে কেউ নিয়ত করবে তার ভ্রমণে কোন স্থানে সে ১৫ দিন [কিংবা এর বেশী] সময় অবস্থান করবে, তাকে অবশ্যই নামায পূর্ণভাবে পালন করতে হবে [অর্থাৎ সে মুক্বীম ব্যক্তিদের মতো নামায আদায় করবে]। [তিরমিযী, ১:৫৩৩]

উল্লেখ্য উপরোক্ত হাদীস থেকে একটি ব্যাপার পরিষ্কার হয়েছে যে, ১৫ দিন কোন স্থানে অবস্থান বা থাকার নিয়তই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং যদি কারো এই নিয়ত না থাকে এবং কোন জরুরত হেতু ঐ স্থানে শেষ পর্য ১৫ দিন থেকেই যায় তথাপি ঐ ভ্রমণকারী মুসাফির হিসেবেই গণ্য হবে। অন্যদিকে নিয়ত যদি ১৫ দিনের করে ফেলে কিন্তু ১৫ দিন কোন কারণবশত থাকা হয় না তথাপি তাকে মুক্বীমদের মতো পুরো নামায আদায় করতে হবে। মনে রাখা দরকার মুসাফিরী নামায তথা ক্বসর নামায শুধুমাত্র যুহর, আছর ও ইশার ফরয [চার রাকাআতের] ক্ষেত্রে প্রজোয্য। অর্থাৎ এই তিন ওয়াক্তের

ফরয নামায চার রাকাআতের ক্ষেত্রে ২ রাকাআত ক্বসর পড়তে হবে। আরোও স্মরণ রাখা দরকার যে, ইমাম মুক্বীম হলে মুক্তাদীও মুক্বীমের মতো ইমামের পেছনে [চার রাকাআত] পড়তে হবে। কিন্তু জামাআত ছাড়া একা নামায পড়া কিংবা ইমামও মুসাফির হলে নামাযও হবে ক্বসর [দুই রাকাআত]। এ ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ থাকলে অভিজ্ঞ কোন আলিমকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন। মনে রাখা দরকার মুসাফির হয়ে পুরো নামায আদায় করা নিষিদ্ধ। কেউ যদি মনে করে 'আমি মুসাফিরী নামায না পড়ে পুরো পড়ে নেবো' এতে তার নামায হবে না। মুসাফিরী বা ক্বসর নামায আদায়ের নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে।

জামাআতে নামাযে দাঁড়ানোর সঠিক পদ্ধতি

জামাআতের নামাযে সকল মুক্তাদীকে সওফ বা লাইন সোজা করে ক্বিবলামুখী হয়ে সঠিকভাবে দাঁড়ানোর বিশেষ তাগিদ এসেছে। বাস্তবে লাইন সোজা করা ও এতে কোন ফাঁক না রাখা ওয়াজিব বলে সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু আজকাল একদল লোক আছেন যারা নিজেদের পা দু'টো ছড়িয়ে (মাঝখানে বড় ফাঁক রেখে) দাঁড়াতে এক্কেবারে নাছুড়বান্দাহ! আশেপাশে যারা এভাবে দাঁড়ান না তাদের জন্য এদের এই কাজটি সত্যিই বিরক্তির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা নিজেদের পা দু'টো ছড়িয়েই ক্ষান্ত হয় না- পাশের মুসল্লির পায়ের কণিষ্ঠ আঙ্গুলির সাথে নিজেদেরটা লাগিয়ে দিতে চায়! বার বার ঐসব মুক্তাদীরা নিজেদের পা সরাতে থাকেন যাতে ছড়ানেওয়ালার পায়ের সঙ্গে নিজের পা লাগে না। কিন্তু একই সময় দেখা যায় ছড়ানেওয়ালা তার পা আরো বেশী ছড়িয়েও মুসল্লির পায়ের মধ্যে পা লাগাতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এরূপ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে এক মুরুব্বি একদা ঐ ছড়ানেওয়ালার পায়ের উপর পা রেখে খুব সজোরে চাপ দিয়ে তাকে বুঝাতে চেয়েছেন- "আমি চাই না তোমার পা দ্বারা আমার পা নামাযে দাঁড়িয়ে স্পর্শ করা হবে!" তবে এভাবে কাউকে কষ্ট দিয়ে ফিতনা বাড়ানো অবশ্য সঠিক নয়।

তবে বাস্তবে সঠিক পদ্ধতি কোনটি? তাই আমরা এই ব্যাপারটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে হানাফী মাজহাব মুতাবিক নামাযে ক্বিয়াম (দাঁড়ানোর) করার সঠিক পদ্ধতি হাদীস শরীফের আলোকে বর্ণনা করে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

যারা ছড়িয়ে দাঁড়ানোর পক্ষে, তাদের এই সিদ্ধান্ত এই হাদীসটির উপর নির্ভরশীল: নু'মান বিন বশীর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাদেরকে অবশ্যই লাইনগুলো সম্পূর্ণরূপে সোজা করতে হবে, অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরকে বিভক্ত করে ফেলবেন"।' হযরত নু'মান বিন বাশীর রাদ্বিআল্লাহু আনহু আরো বলেন, 'আমি তখন লক্ষ্য করলাম সকলে একে অন্যের কাঁধ ও পায়ের গোড়ালী একত্র করে নিচ্ছেন'।" [আবু দাউদ, সহীহ ইবনে খুজাইমা]

হযরত নু'মান রাদ্বিয়াআল্লাহু তাআলা আনহু এর শেষোক্ত উক্তিটি ইমাম বুখারীও লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে এই হাদীসটি সূক্ষ্মভাবে গবেষণার পর মুহাদ্দিসরা কয়েকটি বিষয়ের উপর দৃষ্টিগোচর করেছেন: ১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীসে কিংবা অন্য কোনটিতে পা দু'টো ছড়িয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ কখনো দেন নি। এছাড়া তিনি একে অন্যের পায়ের গোড়ালী লাগিয়ে দাঁড়াতেও বলেন নি। ২. সাহাবায়ে কিরাম নিজেরাই লাইন সোজা করার তাগিদে এভাবে [উক্ত বিশেষ সময়ে] দাঁড়িয়েছিলেন। কারণ, তাঁরা এসময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক একটি কড়া নির্দেশ শ্রবণ করেন। ৩. হযরত নু'মান বিন বাশীর রাদ্বিআল্লাহু আনহু হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে, সাহাবায়ে কিরাম লাইন সোজা করার সময় এভাবে [একে অন্যের কাঁধ ও পায়ের গোড়ালী] একত্র করে দাঁড়াচ্ছেন নামায শুরুর পূর্বমুহূর্তে। তিনি বলেন নি, নামায চলাকালেও তাঁরা একই অবস্থায় ছিলেন।

সুতরাং উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসীন যেমন হাফিজ ইবনে হাজর আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও আল্লামা শওকানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, সাহাবায়ে কিরাম লাইন সোজা করার ক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে মাঝে মধ্যে নামাযের পূর্বে এরূপ করতেন। অর্থাৎ লাইন সোজা হয়ে গেলেই যারতার পা স্বস্থানে (যেভাবে স্বাভাবিকভাবে ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতে হয়) ফিরিয়ে নিতেন। বাস্তবে হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীস শরীফ থেকে এ কথাটির পূর্ণ সমর্থন মিলে। হাদীসটি নিম্নরূপ।

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "আজকাল যদি আমি এভাবে [পায়ের গোড়ালী তাবিঈদের সঙ্গে একত্রিত] করি তাহলে তাঁরা বন্য ঘোড়ার মতো দৌড়াদৌড়ি করবেন!" [ফাতহুল বা-রী, খণ্ড ২, পৃ ঃ ১৭৬]

এই হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, তাবিঈরা পা ছড়িয়ে দাঁড়ানোর আমলটি খুব বেশী অপছন্দ করতেন। এই হাদীস শরীফ থেকে কয়েকটি বিষয় অবগত হওয়া যায়ঃ ১. হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু এই আমলটি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে দিয়েছিলেন। ২. যদি এটা একটি সুন্নাত আমল হতো তাহলে হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু কখনও অপরের অপছন্দের ভিত্তিতে তা পরিত্যাগ করতেন না। ৩. তাবিঈন কখনো তা অপছন্দ করতেন না- যদি তাঁরা এই আমলের উপর সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম প্রতিষ্ঠিত আছেন বলে দেখতেন। ৪. সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে এরূপ আমল অত্যল্প ছিল [বা পরবর্তীতে আদৌ ছিলো না] বলেই তাবিঈন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম এটাকে অপছন্দ করেছিলেন। ৫. কোন হাদীস থেকে জানা যায় না যে, এরূপ আমল কোন সাহাবায়ে কিরাম পরবর্তীতে অব্যাহত রেখেছেন।

উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা এই আমল করার বৈধতা যে গ্রহণযোগ্য নয় তা আর পাঠকদেরকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন বলে মনে করি না। এরপরও প্রথমে উদ্ধৃত হাদীস শরীফের ভিত্তিতে যদি আমরা মেনেই নেই যে, লাইন সঠিক করতে যেয়ে নামাযের পূর্বমুহূর্তে যেহেতু সাহাবায়ে কিরাম [একবার মাত্র হলেও] ছড়িয়ে একে অন্যের গোড়ালী ছুঁইয়ে দাঁড়িয়েছেন, তাই তা করা কোন দোষের নয়। কিন্তু এরপরও প্রশ্ন থেকে যায়, নামাযের ভেতর অন্যান্য অবস্থায় তা কি প্রযোজ্য হবে বা আদৌ কি তা আমল করা সম্ভব? এছাড়া আমরা লক্ষ্য করেছি, অনেকে একা একা নামায আদায় করতে যেয়েও পা ছড়িয়ে দাঁড়ায়! অথচ উক্ত হাদীসটি [যার উপর ভিত্তি করে তারা এই আমল করেন বলে দাবী করেন] একমাত্র জামাআতে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আমারা দৃঢ়ভাবে এ ব্যাপারে হানাফী মাজহাব অনুযায়ী পাঠকদেরকে অবগত করতে চাই যে, পা ছড়িয়ে (ছরাইয়া) দাঁড়ানো সঠিক নয়। বাস্তবে এখানে বর্ণিত প্রথম হাদীস শরীফসহ আরো কয়েকটি হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, লাইন বা সওফ সোজা করা ওয়াজিব। এটা করতে যেয়ে

নামাযের পূর্বে সাহাবায়ে কিরাম নিজেরাই পাশের ব্যক্তির পায়ে পা লাগিয়ে কিছুটা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাইন ঠিক করতেন। এরপর নামাযের ভেতর একই অবস্থায় থাকার পক্ষে কোন সরাসরি প্রমাণ বিদ্যমান নেই। বরং পরবর্তীতে এরূপ অভ্যেস থেকে সবাই বিরত থাকেন।

আমরা এবার সঠিক পদ্ধতিতে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে কিছু উক্তি এখানে তুলে ধরছি। আমাদের অনুরোধ থাকবে- সবাই এভাবে নামায আদায় করার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

মু'মিনের নামায

[নিম্নল্লিখিত উপায়ে নামায আদায়ের একটি বর্ণনা শাইখুল মাশাইখ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক প্রণীত গ্রন্থ 'দ্বিয়াউল কুলুব' থেকে সংগ্রহিত হয়েছে। অবশ্য কথাগুলো হুবহু নকল করা হয় নি। লেখক তার নিজের ভাষায় ঐ কিতাবে বর্ণিত পদ্ধতিকে তুলে ধরেছেন এবং এতে তার নিজস্ব কিছু মতামতও আছে যা তার শায়খ কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমিনউদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে শিখতে সক্ষম হন। - সম্পাদক]

নামাযে দাঁড়িয়ে তাক্ববীরে তাহরিমার পূর্বে মুসল্লিকে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে। নামাযে খুজুখুশু বা একাগ্রতা অত্যন্ত জরুরী। আর তা অর্জনের লক্ষ্যেই এই পূর্বপ্রস্তুতি। নিজের খেয়ালকে আল্লাহর দিকে রুজু করুন এবং মনে মনে ভাবুন যে, আপনি বিশ্বের প্রতিপালক মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে হাজির হয়ে গেছেন। তাঁর নির্দেশ পালন ও আনুগত্যতার নিদর্শন স্বরূপ আপনি পৃথিবীর যাবতীয় কিছু ভুলে ক্বিয়াম, রুকু, সিজদা করবেন একমাত্র প্রভু আল্লাহ তাআলাকে রাজী-খুশী করার লক্ষ্যে। আপনার ক্বলবের দিকে খিয়াল রেখে মনে মনে নিয়ত করুন যে, একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর ঝিকির ছাড়া আর অন্য কিছুই সেখানে নেই। সর্বোপরি মনে রাখবেন, এ নামায হয়তো আপনার জীবনের শেষ নামায হতে পারে।

এরপর আপনি ক্বিয়াম তথা দাঁড়ানোর জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ক্বিবলামুখী করে নিন। আপনার সিনা ক্বিবলার দিকে থাকতে হবে আর তা

সম্ভব যখন আপনার দু’ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মুরার দূরত্ব ঠিক সমান হবে। আপনার স্বাস্থ্য ও উচ্চতার উপর নির্ভর করবে দু’ পায়ের পাতার মধ্যখানের দূরত্ব কতটুকু হবে। তবে সাধারণত তা চার আঙ্গুল থেকে ১২ আঙ্গুল পর্যন্ত হতে পারে। নামায যদি জামাআতে হয়ে থাকে তাহলে পাশ্ববর্তী মুসল্লির কাঁধে নিজের কাঁধ লাগিয়ে পায়ের মুরা সমান রেখে সওফ ঠিক করবেন।

সওফ ঠিক করে দাঁড়ানোর পর তাকবীরে তাহরিমা শেষে বাম হাতের জয়েন্টের উপর ডান হাতের তালু বসিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরুন। এরপর নীচের দিকে যতটুকু যায় ততটুকু পর্যন্ত হাত দু’টো স্বাভাবিকভাবে নামিয়ে নেবেন- এতে দেখবেন আপনার বাঁধা হাতদ্বয় এমনিতেই নাভির কিছুটা নীচে যেয়ে পৌঁছাবে। এরপর অবশ্যই আপনার দৃষ্টি সিজদার জায়গার উপর নিবদ্ধ করবেন এবং নিজেকে স্বাভাবিক রাখবেন- অর্থাৎ জোর করে নীচের দিকে নুইবেন না কিংবা বেশী জোর করে সোজা হওয়ারও চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন। এবার ক্বলবের দিকে খেয়াল নিবদ্ধ করে সূরা-কিরাআত পাঠ করুন।

এভাবে দাঁড়ানোর ফলে কয়েকটি বিষয় সুষ্ঠু হবে: ক. আপনি ক্বিবলামুখী হবেন, খ. আপনার দাঁড়ানোর মধ্যে স্বাভাবিকতা বজায় থাকবে- অর্থাৎ কোন ধরনের টেনশন অনুভব করবেন না, গ. মনে একাগ্রতা জন্মাবে এবং ঘ. বিনয় ভাব সৃষ্টি হবে।

সূরা-কিরআত শেষে রুকুতে যেয়ে চোখের দৃষ্টি পায়ের পাতার উপর নিবদ্ধ করুন। হাঁটুর উপর হাতের আঙ্গুলগুলো খোলা অবস্থায় রেখে পিঠ একেবারে সোজা করুন এভাবে, যাতে এর উপর পানিভর্তি কলস রাখলে তা কাত-চিৎ না হয়। অর্থাৎ নিতম্ব, পিঠ ও মাথা একটি সরলরেখায় থাকবে। রুকুর তাছবীহ অন্তত পাঁচবার উচ্চারণ করবেন। মনে রাখবেন সূরা-কিরাআত [যখন নীরবে পড়ার নিয়ম তখন] এমনভাবে উচ্চারণ করবেন যেন আপনি নিজে তা শোনতে পারলেও পাশের ব্যক্তি না শোনেন।

রুকু শেষে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবেন। আপনার হাতদ্বয় উভয় দিকে ছাড়া অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে থাকবে। মনে রাখবেন রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো জরুরী। এবার আপনার চোখের দৃষ্টি পুনরায় সিজদার দিকে ফিরিয়ে নিন।

সিজদায় যাওয়ার সময় ধীরে ধীরে নিজেকে নীচের দিকে নামিয়ে নিন এবং প্রথমে হাঁটুদ্বয় মুসাল্লার উপর রাখুন এরপর দু' হাত [এসাথে অঙ্গুলিগুলো জড়িয়ে নিন যাতে কোন ফাঁক থাকেনা] তারপর নাক ও সবশেষে কপাল সিজদার জায়গায় রাখুন। এবার আপনার দৃষ্টি নাকের দিকে থাকবে। মনে রাখবেন আপনার হাত সোজা ক্বিবলামুখী থাকবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি বরাবর আপনার কাঁধ হবে। সিজদার তাছবীহ অন্তত ৫ বার আদায় করবেন।

প্রথম সিজদা থেকে উঠার সময় প্রথমে কপাল তারপর নাক এবং সবশেষে হাতদ্বয় উঠাবেন। জলসার (বা বসার) সময় বাম পা কাত করে এর উপর বসবেন ও ডান পায়ের অঙ্গুলিগুলো ক্বিবলামুখী রেখে বাঁকা করে মুরা উপরের দিকে রাখবেন। এভাবে দু' রাকাআতের মাঝখানে ও শেষ বৈঠকেও বসবেন। মনে রাখবেন দু' সিজদার মাঝখানে ভালো করে বসা জরুরী। নামাযে কোন সময়ই তাড়াহুড়ো করবেন না- এতে নামাযের মাহাত্ম্য, গুরুত্ব ও খুজুখুশু ক্ষুণ্ন হয়। এমনকি এর ফলে কোন ওয়াজিব নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিংবা নামাজ ফাসিদ হবে।

এরপর দ্বিতীয় সিজদা শেষেও দাঁড়ানোর সময় কপাল, নাক, হাত ও হাঁটু এই তরতীবে উঠাবেন। শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠের সময় 'আশহাদু আল্লা-ইলা-হা' বলার সময় হাঁটু ও উরুর মধ্যে রাখা ডান হাতের শাহাদাত অঙ্গুলি খাড়া করবেন এবং একই সময় বা একটু পূর্বে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমাসহ অন্যান্য অঙ্গুলি দ্বারা একটি বৃত্ত তৈরী করবেন। অর্থাৎ পুরো মুষ্টিবদ্ধ করবেন না। এরপর 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় শাহাদাত অঙ্গুলি নামিয়ে ফেলবেন- তবে মুষ্টিবদ্ধ না করে রেখে দেবেন। এই অবস্থায় [অর্থাৎ শাহাদাত আঙ্গুল খোলা ও হাঁটুর উপরে রাখা এবং অন্যান্য অঙ্গুল দ্বারা খোলাভাবে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায়] বাকী সময় কাটিয়ে দরূদ শরীফ ও দু'আয়ে মাছুরা পাঠ করে সালাম ফেরাবেন। মনে রাখবেন শেষ বৈঠকের সময় আপনার চোখের দৃষ্টি বুক বা কোলের দিকে রাখবেন। সালামের সময় অবশ্যই দু' কাঁধের দিকে দৃষ্টি রাখবেন এবং মনে মনে খেয়াল করবেন ফিরিশতা ও অন্যান্য মুসল্লি এবং তাঁদের কাঁধের ফিরিশতাদেরকে সালাম দিচ্ছেন।

নামাযে হাতের অবস্থা ৪টিঃ ১. বাঁধা, ২. খোলা, ৩. জড়িত ও ৪. স্বাভাবিক। **১.** বাঁধা থাকবে তাক্বীরে তাহরীমার পর থেকে রুকুতে যাওয়ার

আগ পর্যন্ত। ২. খোলা থাকবে রুকুর সময় হাঁটুতে হাত থাকাবস্থায়। ৩. জড়িত থাকবে সিজদার সময়। ৪. অন্যান্য সময় স্বাভাবিক থাকবে।

নামাযে চোখের দৃষ্টি থাকবে ৪ দিকে: ১. দাঁড়ানোবস্থায় সিজদার জায়গার দিকে, ২. রুকুবস্থায় পায়ের পাতার দিকে, ৩. সিজদাবস্থায় নাকের দিকে এবং ৪. বসাবস্থায় কোল ও বুকের দিকে।

সিজদায় যাওয়ার তরতীব: সিজদায় যেতে আকাশের নিকটস্থ অঙ্গ তথা কপাল সব শেষে এবং জমিনের নিকটস্থ অঙ্গ সব আগে। সুতরাং প্রথমে মুসাল্লায় যাবে হাঁটু [এটা জমিনের নিকটস্থ অঙ্গ], এরপর হাতদ্বয় [এগুলো জমিনের পরবর্তী নিকটস্থ অঙ্গ], তারপর নাক [এটা জমিনের পরবর্তী নিকটস্থ অঙ্গ] এবং সবশেষে কপাল [যা আকাশের নিকটস্থ অঙ্গ]।

সিজদা থেকে উঠার তরতীব: সিজদা থেকে উঠার সময় প্রথমে উঠবে আকাশের নিকটস্থ অঙ্গ এবং সবশেষে উঠবে জমিনের নিকটস্থ অঙ্গ। সুতরাং প্রথমে উঠবে কপাল, তারপর নাক, এরপর হাত ও সবশেষে হাঁটু। লক্ষ্য করুন সিজদাবস্থায় কপাল জমিনের নিকট, এরপর জমিনের নিকট থাকে নাক, তারপর জমিনের নিকট হলো হাত আর সবশেষে হাঁটু যা সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ অঙ্গ।

একনজরে হানাফী পদ্ধতিতে নামায

সুপ্রিয় পাঠকদের সুবিধার্থে নামাযের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করা হলো। এখানে গ্রন্থিত প্রতিটি ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব আমল হানাফী ফিকহ এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং হানাফী মাজহাবপন্থী সকলেই নিশ্চিন্তে এসব আমল করতে পারবেন।

নামাযের আহকাম ও আরকান

নামাযের বাইরে আহকাম বা শর্ত মোট ৭টি: ১. শরীর পাক, ২. কাপড় পাক, ৩. নামাযের স্থান পবিত্র, ৪. সতর ঢাকা, ৫. কিবলামুখী হওয়া, ৬. নিয়ত করা এবং ৭. তাকবীরে তাহরিমা।

নামাযের ভেতরে আরকান বা ফরয মোট ৬টি: ১. ক্বিয়াম বা দাঁড়িয়ে নামায পড়া, ২. কিরাআত পাঠ (কুরআন শরীফ থেকে একটি লম্বা কিংবা

ছোট্ট তিনটি আয়াত পড়া), ৩. রুকু করা, ৪. সিজদা করা, ৫. আখেরী বৈঠক এবং ৬. (সালাম ফিরিয়ে) স্বেচ্ছায় নামায শেষ করা।

নামাযের ওয়াজিব

নামাযে মোট ১৩টি ওয়াজিবঃ ১. ফরয নামাযে প্রথম দুই রাকাআতে এবং বিতির, সুন্নাত ও নফল নামাযের সব রাকাআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা, ২. ফরয নামাযের শেষের দুই রাকাআত ছাড়া অন্যান্য সকল রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর অপর কোন সূরা বা এর কোন অংশ পাঠ করা, ৩. নামাযের ফরযসমূহ নিজ নিজ স্থানে আদায় করা, ৪. প্রথম বৈঠক করা (চার রাকাআত নামাযে দুই রাকাআত পর তাশাহ্হুদ পাঠের সমপরিমাণ সময় বসা) ৫. উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা, ৬. বিতির নামাযের সময় তাকবীর শেষে দু'আয়ে কুনুত পাঠ করা, ৭. দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ৬ তাকবীর বলা, ৮. প্রত্যেক ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাআতকে এবং অন্যান্য নামাযের সকল রাকাআতকে ক্বিরাআতের জন্য নির্ধারিত করা, ৯. রুকু ও সিজদায় অন্তত এক তাসবীহ পরিমাণ সময় কাটানো এবং সোজা হয়ে দাঁড়ানো ও সোজা হয়ে বসা, ১০. ফযর, মাগরিব, ইশা, জুমু'আ, ঈদ ও তারাবীহ (এবং তারাবীহ শেষে জামাআতে বিতির আদায়কালে) ইমামকে সরবে ক্বিরাআত পাঠ করা, এটাকে বলে জাহরী নামায, ১১. যুহর, আসরের নামাযে ইমামকে এবং একাকী নামায আদায়কারীকে চুপি চুপি সূরা-ক্বিরাআত পাঠ করা, এটাকে বলে সিররী নামায, ১২. আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্ বলে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করা এবং ১৩. সূরা ফাতিহা অন্য সূরা-ক্বিরাআতের পূর্বে পড়া। (দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ আবদুল লতিফ চৌধুরী; ফাতওয়ায়ে আলমগিরী)

(**দ্রঃ** উপরোক্ত ওয়াজিবগুলোর মধ্যে একটিও যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ছাড়া হয় তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। পুনরায় পড়তে হবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন ওয়াজিব ছুটে যায় তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে- এতে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। - ফাতওয়ায়ে আলমগিরী)

নামাযের সুন্নাত

নামাযে মোট ২৫টি সুন্নাত আছেঃ ১. তাকবীরে তাহরিমার সময় উভয় হাত কান পর্যন্ত ওঠানো (মহিলাদের জন্য কাঁধ পর্যন্ত ওঠানো), ২. তাকবীরে তাহরিমার সময় মাথা সোজা রাখা (ঝুঁকাবেন না), ৩. ইমামের জন্য তাকবীর, তাসমীহ (সামি'আল্লাহুলিমান হামিদা) এবং সালাম প্রয়োজনমাফিক সজোরে উচ্চারণ করা, ৪. সুবহানাকা .. (সানা) নীরবে বলা, ৫. আউযুবিল্লাহ ... (তাআওউয) নীরবে বলা, ৬. বিসমিল্লাহ .. (তাসমিয়া) নীরবে পাঠ করা, ৭. সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে (ইমাম ও মুক্তাদি) নীরবে 'আ-মিন' বলা, ৮. পুরুষের জন্য নাভির নীচে (নাভি ঘেষে) এবং মহিলাদের জন্য বুকের উপর বাম হাত নীচে ও ডান হাত উপরে রেখে হাত বাঁধা, ৯. ফযর নামাযে ৫০ আয়াত, যুহরের নামাযে ৩০ আয়াত, আসরের ও ইশার নামাযে ২০ আয়াত এবং মাগরিবে ছোট ছোট সূরা পাঠ করা, ১০. রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলা, ১১. রুকু থেকে ওঠার সময় 'সামি'আল্লাহুলিমান হামিদাহ' বলা, ১২. রুকুর মধ্যে অন্তত তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' পাঠ করা, ১৩. রুকুর মধ্যে মাথা, পিঠ ও নিতম্ব বরাবর রেখে উভয় হাতের আঙ্গুল খোলা রেখে শক্তভাবে হাঁটুতে ধরা (মহিলারা কেবল হাত রাখবেন- শক্তভাবে ধরবেন না), ১৪. সিজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর বলা, ১৫. সিজদা থেকে মাথা উত্তোলনের সময় তাকবীর বলা, ১৬. সিজদায় অন্তত তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' পড়া, ১৭. আত্তাহিয়্যাতু পাঠের সময় পুরুষরা বাম পা বিছিয়ে ডান পা খাড়া করে আঙ্গুল বাকা করে কিবলামুখী রেখে বসা, ১৮. দুই সিজদার মাঝে কিছুক্ষণের জন্য বসা, ১৯. শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পর দরূদ শরীফ পাঠ, ২০. দরূদ শেষে দু'আয়ে মাছুরা পাঠ করা, ২১. তাশাহহুদ পাঠকালে 'আশহাদু আল্লা-ইলাহা' বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল তুলে ইশারা করা এবং পরে নামিয়ে নেওয়া (মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি একত্র করে বৃত্তের মতো বানিয়ে সালাম ফেরানোর পূর্ব পর্যন্ত কিংবা দাঁড়ানোর পূর্ব পর্যন্ত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় ডান হাত রাখা, এসময় শাহাদাত আঙ্গুল সোজা অবস্থায় হাঁটুর উপর থাকবে।), ২২. ফরয নামাযের শেষ দুই রাকাআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা, ২৩. বিতির নামাযে দুআ কুনুতের পূর্বে হাত উঠিয়ে তাকবীর দেওয়া, ২৪. জামাআতে নামায পড়ার সময় ইমামকে 'সামি'আল্লাহুলিমান হামিদাহ' বলার

পর মুক্তাদিরা নীরবে 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলা এবং একাকী নামায পড়ার সময় উভয়টি বলা এবং ২৫. সালামের সময় পার্শ্বস্থ মুসল্লি ও ফিরিশতাদের প্রতি সালাম দেওয়ার নিয়ত করা।

নামাযের মুস্তাহাব

নামাযে মোট ২১টি মুস্তাহাব আছে: ১. তাহরিমা বাঁধাবস্থায় উভয় হাতের কব্জা জামার আস্তিনের বাইরে রাখা, ২. দাঁড়ানো অবস্থায় পুরুষরা উভয় পায়ের দূরত্ব অন্তত চার আঙ্গুল পরিমাণ রাখা এবং উভয় মুরা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির দূরত্ব সমান রেখে কিবলা ঠিক করা; মহিলারা উভয় পা একত্র করে রাখবেন, ৩. একাকী নামাযের সময় তাসবীহসমূহ তিনবারের বেশী (বেজোড় সংখ্যায়) পাঠ করা, ৪. দাঁড়ানোবস্থায় দৃষ্টি সিজদার জায়গার দিকে স্থির রাখা, ৫. রুকুর সময় দৃষ্টি পায়ের পাতার উপর স্থির রাখা, ৬. সিজদার সময় দৃষ্টি নাকের অগ্রভাগের দিকে থাকা, ৭. মধ্যবর্তী ও শেষ বৈঠকের সময় কোলের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখা, ৮. সালাম ফেরানোর সময় নিজের কাঁধের দিকে দৃষ্টি রাখা, ৯. দাঁড়ানো অবস্থায় হাই ও হাঁচির সময় ডান হাতের পিঠ দ্বারা রোধ করা এবং অন্যান্য সময় বাম হাতের পিঠ ব্যবহার করে রোধ করা, ১০. সাধ্যমত হাঁচি ও কাশি না দেওয়ার চেষ্টা করা, ১১. উভয় হাতের মাঝখানে নাক-কপাল সিজদার জায়গায় লাগিয়ে সিজদা করা, ১২. সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দুই হাঁটু জমিনে রাখা, ১৩. তারপর উভয় হাতের আঙ্গুল একটা আরেকটার সাথে লাগিয়ে সোজা করে কিবলামুখী রেখে জমিনে রাখা, ১৪. এরপর নাক রাখা, ১৫. অবশেষে কপাল রাখা, ১৬. সিজদার সময় পুরুষের পেট ও রান আলাদা রাখা, ১৭. মহিলাদের পেট রানের সাথে মিলিয়ে রাখা, ১৮. তাসবীহ বেজোড় সংখ্যক পাঠ করা, ১৯. সিজদা হতে ওঠার সময় প্রথমে কপাল, তারপর নাক, এরপর হাত এবং সবশেষে হাঁটু (দাঁড়াতে হলে) উঠানো, ২০. উভয় বৈঠকের সময় দুই হাত হাঁটুর উপর (স্বাভাবিকভাবে) রাখা এবং ২১. প্রথমে ডানদিকে এবং পরে বামদিকে সালাম ফেরানো। (প্রাগুক্ত)

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে মাজহাবের গুরুত্ব বুঝা ও সঠিকভাবে যাবতীয় আমল করার তাওফিক দিন। আমাদেরকে আধুনিক যুগের বিভিন্ন ফিতনা থেকে রক্ষা করুন- আ-মিন।

সহায়ক কিতাবাদি

ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, "আল-মাজমু'অ শহারিল মুহাজযাব" (খ. ১, পৃঃ ৯৩)।

ইমাম ইবনে হুম্মাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, "হিদায়া ফাতহুল ক্বাদির" (খ. ৬, পৃঃ ৩৬০)।

ইমাম শা'রানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, "আল-মিযানুল কুরবা" (খ. ১ পৃঃ ৫৫)।

শায়খ সালেহ সানুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, "ফাতহুল 'আলীল মালিকী ফিল-ফাতওয়া 'আলা মাজহাব ইমাম মালিক" (উসূল ফিকহ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৪০-৪১)।

শায়খুল ইসলাম আহমদ ইবনে হাজর হাইতামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, "তুহফাউল মুহতাজ ফী শাহরিল মিনহাজ" (খ. ১২, কিতাবুয যাকাত, পৃঃ ৪৯১)।

ইমাম আহমদ আল-ওয়ানশিরিসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, "আল-মি'য়ারুল মু'রিবুন ফাতওয়া আহলিল ফিরকিয়্যা ওয়াল আন্দালুস ওয়াল মাগ্বরিব" (খ. ১১ পৃঃ ১৬৩-১৬৪)।

ইমাম সাইফুদ্দীন আমিদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, "আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম"(খ. ৪ পৃঃ ২৭৮)।

ইমাম জাহিদ কাওসারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, "আল-লা মাজহাবিয়া ক্বানতারাল লা দ্বীনিয়া" (পৃঃ ২২৪-২২৫)।

ইমাম শামসুদ্দীন মাহাল্লী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, "জমিয়াল জাওয়ামী (শাফিঈ ফিকহ - কিতাবুল ইজতিহাদ)" (পৃঃ ৯৩)।

ইমাম রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, "ফাতওয়ায়ে রশীদিয়া" (পৃঃ ২০৫)।

শায়খ আবদুল হাই লাখনৌবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, "মুজমুয়াতুল ফাতওয়া" (খ. ৩, পৃঃ ১৯৫)।

ইমাম রজব হাম্বলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, চার মাজহাব ছাড়া যারা অন্যকিছুর অনুসরণ করে তার খণ্ডন (পৃঃ ৬)।

মালিকী ফিকহী গ্রন্থ, "মারাক্বি আস-সাউদ" (পয়েন্ট ৯৭৫, পৃঃ ৩৯)।

ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, "আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন (তাফসীর গ্রন্থ)", সূরা আম্বিয়ার ৭ নং আয়াতের তাফসীর (খ. ১১, পৃঃ ১৮১)।

পবিত্র কোরআনুল কারীমঃ বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর-মাআরেফুল কোরআন, মূলঃ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সূরা নিসার ৫৯ নং এবং সূরা নাহলের ৪৩ নং আয়াতের তাফসীর (খ.১ পৃঃ ২৬০ এবং ৭৪২-৭৪৩)।

মুফতি তকী উসমানী দামাত বারাকাহুম, "আল-মিসবাহ ফী রাসম আল-মুফতি ওয়া মানাহিজুল ইফতা (ব্যাখ্যা)" (খ. ১, পৃঃ ২৫১-২৫২)।

শায়খ সালেহ বিন উতাইমিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (সালাফী স্কলার), "আল-উসূল মিন ইলমুল উসূল (তাক্বলিদ অধ্যায়)" (পৃঃ ৬৮)।

উক্ত কিতাবসমূহ ছাড়াও পবিত্র হাদীস শরীফের বিভিন্ন কিতাবসহ আরো বেশ ক'টি কিতাব থেকে তথ্য সংগ্রহিত হয়েছে। গ্রন্থের সর্বত্র পৃষ্ঠাসহ এসব কিতাবের কথা উল্লেখিত আছে। তাক্বলিদ, মাজহাব ও হানাফী ফিকহে নামায সম্পর্কে এ গ্রন্থে যাকিছু যুক্তি ও দলিলভিত্তিক লিপিবদ্ধ হয়েছে তা-ই সর্বসাধারণের অনুসন্ধিৎসা মেটানোর জন্য আমরা যথেষ্ট মনে করছি। এরপরও যদি কেউ বিষয়ের আরো গভীরে যাওয়ার ইচ্ছে রাখেন তাহলে এই কিতাবগুলো পাঠ করতে পারেনঃ ১. আল্লামা শাতিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত, "কিতাবুল মুয়াফাকাত"; ২. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত, "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা" এবং "ইক্বদুল জীন"; ৩. হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত, "আল-ইসতিহাদ ওয়াল ইজতিহাদ" ইত্যাদি। এছাড়া চার মাজহাবের

ফিকহের উপর রচিত মূল কিতাবাদিও তাক্বলিদ, ইজতিহাদ, মাজহাব ইত্যাদির উপর গভীর জ্ঞানার্জনের মৌলিক সূত্র। প্রয়োজনে এগুলোও অধ্যয়ন করতে পারেন।